দ্য ব্ল্যাক অবিলিস্ক

এরিক মারিয়া রেমার্ক

সেবা প্রকাশনী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য ব্ল্যাক অবিলিস্ক

মূলঃ এরিক মারিয়া রেমার্ক

রূপান্তরঃ শেখ আবদুল হাকিম

প্রথম প্রকাশঃ ২০০০

এক

'বেতন না বাড়ালে তো আর চলছে না, স্যার।'

'কি! কালই না তোমার বেতন বাড়ালাম?'

'জ্বী-না, কাল নয়। বাড়তি বেতন আজ সকালেই পেয়েছি। সকাল ঠিক ন'টায়। অতিরিক্ত দশ হাজার মার্ক। দশ হাজার মার্কের দাম তখন তবু কিছুটা ছিল। কিন্তু এখন তার কোন দাম নেই। দুপুরের বিজ্ঞপ্তিতে মার্কের দাম বলা হয়েছে ডলার পিছু ছত্রিশ হাজার...'

'ইস্, কি সর্বনাশ!'

'হ্যাঁ, এক ডলার পেতে হলে এখন ছত্রিশ হাজার মার্ক লাগবে। একটা টাই কেনার ইচ্ছে ছিল বলেই বেতন বাড়াবার কথাটা তুলেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি দশ হাজার মার্কে টাই কেন, একটা রুমালও কেনা যায় না।'

জর্জ ক্রলের হাতে একটা চুরুট জ্বলছে। চোখ বড় বড় করে সেটার আগুন দেখছে সে। তার এই চুরুট ব্রাজিল থেকে আমদানি করা। 'ছত্রিশ হাজার মার্ক মানে এক ডলার? বাহ্! একেই বোধহয় ইঁদুরের দৌড় বলে, তাই না? ভাবছি, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে।'

'নরকে। কিন্তু এখন আমাদের বাঁচার উপায় কি? টাকা-পয়সা কি কিছুই আমদানি হয়নি?'

'নিজেই দেখো, একটা সুটকেসও ভরেনি। আজ আর কাল এই দিয়েই কোনরকমে চালিয়ে নিতে হবে। নোটগুলো বেশি বড়ও নয়। অনেকগুলো একশোর বাণ্ডিল, পাঁচশো আর হাজারই বেশি, দশ হাজার অল্প কয়েকটা। ইংলিশ মুদ্রায় যদি হিসাব করি, সব মিলিয়ে পাঁচ পাউণ্ড হতে পারে। ডলারের গায়ে এত দ্রুত চর্বি জমছে, আমাদের রাইখস্ ব্যাংক রাতদিন নোট ছাপিয়েও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। দু'হপ্তাও হয়নি এক লাখ মার্কের নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে মিলিয়ন মার্কের নোট না ছাপলে চলবে না। দেখো না কবে শুনতে হয় বিলিয়ন মার্ক বাজারে আসছে।'

উনিশশো তেইশ সালের এপ্রিল মাস। ক্রল কোম্পানির ব্যবসা মন্দা, আমাদের শত্রুও এ-কথা বলতে পারবে না। আসলে বেচা-বিক্রি সবারই খুব ভাল। কিন্তু ওটাই তো সমস্যা! যত বিক্রি তত লোকসান। সকালে যে জিনিসটা যে দামে বেচলাম, বিকেলে সেই জিনিসটা কিনতে গেলে দ্বিগুণ দাম দিতে হবে আমাকে। স্টক আর কতই বা থাকে কার? বিশেষ করে আমাদের ক্রল কোম্পানির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাল তো গুদামে তুলতে না তুলতে আবার বের করে আনতে হয়। বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টাই চাহিদা আছে। মানুষের তো আর মরার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই, তাই সারাক্ষণই মরছে। আর মানুষ মরলেই তার আত্মীয়স্বজনকে ছুটে আসতে হয় আমাদের কাছে।

এই মৃত্যু নিয়ে, কবরখনকদের নিয়ে লিবারম্যান কি বলে শুনবেন? তার মতে বেশিরভাগ মানুষ বসন্ত আর হেমন্তকালেই মরে। বসন্তের দিনে মনে জাগে ফুর্তির জোয়ার। যতটুকু সামর্থ্য, তারচেয়ে বেশি উপভোগ করতে গিয়ে অর্ধাহারে দুর্বল হয়ে থাকা শরীরগুলো হঠাৎ ভেঙে পড়ে। আর হেমন্তে কি হয়? আনন্দ-ফুর্তির ঢল নেমে যাবার পর আসে চরম হতাশা ও ক্লান্তি, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে দুর্ভাগারা যে একটু লড়বে সেই শক্তিও আর অবশিষ্ট থাকে না।

লিবারম্যান মিউনিসিপ্যালিটির গোরস্থানে কবর খোঁড়ে। তার মতামতের মূল্য আছে। বয়স আশি, এ-পর্যন্ত দশ হাজার বা তারও বেশি কবর খুঁড়েছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বেতন পায়, আর ক্রল বা অন্য কোম্পানি থেকে পায় কমিশন। কবরের ওপর পাথরের ফলক, ক্রস ইত্যাদি বসাবার কাজও সে করে। অনেক সময় বড় বড় মক্কেলরা স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাতে চায়, এই সব অর্ডার সংগ্রহ করে আনে সে। কমিশন পায় শতকরা দশ ভাগ। কবর খোঁড়ার এই কাজে দীর্ঘদিন লেগে থেকে নদীর ধারে একটা বাড়ি কিনেছে লিবারম্যান। মাছের একটা ভেড়িরও সে মালিক। তার কথা হলো, নিয়মিত যথেষ্ট সংখ্যায় মানুষ মরতে থাকলে কবরখনকদের আর দুঃখ করার কিছু থাকে না।

ক্রল কোম্পানির কর্মচারী আমি। আমার নাম লাডউইগ বডমার। আমিই একাধারে এই কোম্পানির ম্যানেজার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও পাবলিক রিলেশন্স অফিসার। চার বছর হলো এই চাকরিতে আছি। যুদ্ধ থামার পর কাইজার হল্যাণ্ডে গেলেন, আর আমি এলাম ছোট শহর এই ওয়ার্ডেনব্রাকে। জর্জ ক্রলই নিয়ে এল আমাকে। আমরা একসঙ্গে বছর চারেক ট্রেঞ্চে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি।

আমি ছিলাম ল্যান্স-করপোরাল, জর্জ ছিল সার্জেন্ট-মেজর। পদমর্যাদা এক নয়, নয় বয়সও। আমাকে যখন ওরা টান দিয়ে যুদ্ধে নিয়ে গেল, দাড়ি-গোঁফ কিছুই তখন আমার গজায়নি। বয়স ছিল সতেরো বছর ছ'মাস। সেটা উনিশশো তেরোর কথা। এর সঙ্গে সাতটা বছর যোগ করলেই আমার বয়স বেরিয়ে আসে। বয়সে আমার চেয়ে জর্জ অনেক বড়, চল্লিশ পার হয়ে গেছে তার। বেঁটে, ভুঁড়িসর্বস্ব, চর্বি আর মাংসের মস্ত একটা স্তূপ বলা যেতে পারে তাকে। দূর থেকে চেনার উপায় হলো মাথা জোড়া চকচকে টাক। চেহারাটাই এমন যে তাকালেই হাসি পায়। তা সত্ত্বেও রণক্ষেত্রে যতদিন ছিলাম, তার পদমর্যাদার প্রাপ্য সম্মানটুকু যথারীতি দিয়েছি আমি। তারপর যুদ্ধও শেষ হলো, জর্জও পদ আর বয়স ভুলে আমাকে টেনে তুলে নিল নিজের পাশে, সব দিক থেকে দান করল সমকক্ষতার মর্যাদা। এ তার মহত্ত্বেরই লক্ষণ। যুদ্ধের পর দেখা গেল আমি শুধু নিঃসঙ্গ আর একা নই, ঠিকানা বা চাল-চুলো কিছুই আমার নেই। জর্জই হাত ধরে নিয়ে এল ওয়ার্ডেনব্রাকে। এখানে তাদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল, সেখানেই আমাকে কাজ দিল, আমি হলাম ওদের কোম্পানির অলরাউণ্ডার কর্মচারী। থাকিও ওদের

www.BanglaBook.org

বাড়িতে। বাড়িটা বেশ বড়, তারচেয়েও বড় সংলগ্ন বাগানটা।

এই বাগানে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের ব্যবসার সমস্ত কাঁচামাল। বেশিরভাগই বিভিন্ন আকৃতির স্মৃতিফলক। কোনটা নিরাভরণ শ্বেতপাথর, কোনটা অলঙ্কৃত। আর আছে অসংখ্য ক্রস।

ওগুলোর সঙ্গে আর আছে কালো গ্র্যানিট পাথরের একটা স্মৃতিস্তম্ভ। অভিধানে এটার নাম অবিলিস্ক। খুব বেশি উঁচু নয়, মাঝারি-চৌকো একটা স্তম্ভ, ওপরের দিকে ক্রমশ সরু। একেবারে মাথায় পিরামিড আকৃতির গাঁথনি, যেন টোপর পরানো।

স্মৃতিস্তম্ভটা বহু কাল হলো বাগানে পড়ে আছে। এটা আমদানি করেছিলেন জর্জের বাবা, কিন্তু বেঁচে থাকতে রফতানি করবার সুযোগ পাননি। সে সুযোগ থেকে জর্জ আর তার ভাই হেনরিকও এখন পর্যন্ত বঞ্চিত।

বাড়িটার দোতলায় ওরা দুই ভাই আর ওদের বুড়ি মা থাকেন। ওই দোতলারই একদিকের একটা কামরায় থাকি আমি। বাড়ির বাকি অংশে কয়েকটা পরিবার ভাড়া থাকে। আমাদের ওপরতলায় দুটো কারখানাও আছে। একটার মালিক কফিন মিস্ত্রী উইলকি, আরেকটার মালিক পাথর খোদাই করার কারিগর কার্ট ব্যাশ। ক্রল কোম্পানির ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় ওই কারখানা দুটো কাছাকাছি থাকাই উচিত, তাতে সংশ্লিষ্ট সবারই সুবিধে। কফিন, স্মৃতিফলক, ক্রস, ফলক খোদাই করার কারিগর-সব এক জায়গায় পেয়ে যাবে খদ্দের। মরহুম মি. ক্রলের ব্যবসা-বুদ্ধি যে প্রখর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্রাজিল লেখা প্যাকেট থেকে আমাকে একটা চুরুট দিল জর্জ। সারা ঘরে ধোঁয়া উড়িয়ে ব্যবসার হালচাল নিয়ে আলাপ করছি আমরা। এই সময় নিচে থেকে ভেসে এল ক্রিং ক্রিং, সাইকেলের বেল।

'হেনরিক,' বলল জর্জ।

ও না বললেও বুঝতে অসুবিধে হত না যে হেনরিক ফিরেছে। সাইকেলের ঘণ্টা থেকে এতটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ একমাত্র সেই বের করতে পারে। বেল তো নয়, যেন কোন ফিল্ড মার্শালের হুইসেল।

গটগট করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল হেনরিক। মাথার হ্যাট এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে।

বাইরে কিন্তু রোদ তো নেইই, বরং বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এখন যারা রাস্তায় চলাচল করছে তাদের ঘামবার কোন কারণ নেই। হেনরিকও ঘামেনি। তবু এই যে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে সে, এটা তার ভান। নিজের ভঙ্গি দিয়ে আমাদেরকে বলতে চাইছে, 'এভাবে ঘরে বসে আড্ডা মারছ, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। একজনের দেখেও তো মানুষ শেখে। ব্যবসার উন্নতির জন্যে সারাক্ষণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি আমি, আর তোমরা...'

'ক্রসটা বেচে এলাম,' বড় ভাইকে সবিনয়ে বলল হেনরিক। তার এই বিনীত নিবেদন সিংহের গর্জনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, ছোট্ট ঘরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কোন ক্রসটা? ছোট্ট মার্বেল...?'

'আরে না! বড়টা, গ্র্যানিটেরটা!' ক্রল কোম্পানির ছোট মালিক সগর্বে বলল।

'দেখো কাণ্ড!' আমার গলায় রাজ্যের হতাশা, তাকিয়ে আছি জর্জের দিকে।

হেনরিকের শিরদাঁড়া টান টান হলো। চেহারায় বিস্ময়, গলায় রাগ, জানতে চাইল, 'তারমানে? যেন মনে হচ্ছে মাল বিক্রি না হলেই খুশি হও তুমি?'

'বর্তমান পরিস্থিতিতে সত্যি খুশি হই,' গম্ভীর হয়ে বললাম আমি। 'ওটা খুব উন্নতমানের গ্র্যানিট ছিল। বেচলে ঠিকই, কিন্তু ওই রকম আরেকটা ক্রস তুমি কিনে আনতে পারবে না।'

'কেন কিনে আনতে পারব না? তাছাড়া, কিনতে যাবই বা কেন?' আরও রেগে গেল হেনরিক।

'এই জন্যে পারবে না যে বাজারে ওই একটাই ছিল, আর নেই। এখন যদি আমরা ওডেনওয়ার্ল্ড গ্র্যানিট কোম্পানিকে ওই জিনিসেরই অর্ডার দিই...জানতে পারি, কতোয় বেচলে ওটা?'

'সাত লাখ পঞ্চাশ হাজারে। খোদাই আর প্যাকিঙের জন্যে আলাদা মজুরি পাওয়া যাবে। ঠকে একেবারে ভূত হয়ে গেছি, কি বলো? খাতা আমার আগেই দেখা আছে, কেনার সময় দাম পড়েছিল মাত্র ষাট হাজার...'

হেনরিকের মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল। আমি যেন তার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছি।

এবার মুখ খুলল জর্জ। সে নরম মিষ্টি সুরেই শুরু করল। 'ভাইরে, কোম্পানির জন্যে তুই যে প্রচণ্ড খাটাখাটনি করছিস তা আমরা সবাই জানি। সেজন্যে আমি আর লাডউইগ সব সময় তোর প্রশংসা করছি। কিন্তু তারপরও, আমাদের দু'জনেরই ধারণা, ওই ক্রসটা এখন বিক্রি না করলেই ভাল হত। সত্যি কথা বলতে কি, বেশ বড় একটা লোকসান হয়ে গেল। আমরা কি বলছি তা বুঝতে হলে তোকে হিসাব করে বের করতে হবে তখনকার বাজারে ষাট হাজার মার্কের কি দাম ছিল, আর এখনকার বাজারে সাড়ে সাত লাখেরই বা কি দাম পাওয়া যাবে। আমি মুদ্রাস্ফীতির কথা বলছি, হেনরিক। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে যুদ্ধের পর থেকে। এমন ফোলাই ফুলছে, ফেটে যাবার মত অবস্থা...'

চেয়ার ছেড়ে ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল হেনরিক, ছোঁ দিয়ে হ্যাটটা তুলে মাথায় চাপাল। 'এ-সব আমাকে শেখাতে হবে না। আমি কি গাধা?'

এরপর আর কথা চলে না। বাধ্য হয়েই অন্য প্রসঙ্গে যেতে হলো জর্জকে। 'দামটা কি পেয়েছিস?'

'এত তাড়াতাড়ি?' প্রতিবাদের সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল হেনরিক। 'জিনিস পরখ না করে কেউ দাম দেয়?'

'দেওয়াই রেওয়াজ,' বলল জর্জ। 'না দিলে চেয়ে নিতে হয়।'

'চেয়ে নেব? কার কাছ থেকে চাইব, শুনি? একজন মানুষ সদ্য মারা গেছে, কবরের ওপর ফুল এখনও শুকায়নি, সেই কবরে কবে ক্রস বসানো হবে তার নেই ঠিক, আজ আমি তাদের কাছে হাত পেতে বসে থাকব? মরা লোকটার আত্মীয়স্বজনরা আমাকে গাল দেবে না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, দেবে না, কারণ মনটা তাদের এখনই মাখনের মত নরম হয়ে আছে...'

'মানতে পারলাম না। বরং উল্টোটাই সত্যি। এই মাত্র আজরাইলের কাছে ঠকল তারা, এখুনি কোন মানুষের কাছে ঠকতে চাইবে না। ক্যাটালগে ক্রস, স্মৃতিফলক আর স্মৃতিস্তম্ভের যতই বাহারি ছবি ছাপা থাক, তারা আগে দেখতে চায় কবরের ওপর জিনিসটা কেমন মানাবে...'

'তাই যদি দেখতে চায়, দামটাও আমরা সেদিনই ঠিক করব। আমাদেরকেও তো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে হবে, তাই না? নিজেই তো দেখছিস, মার্কের দাম প্রতিদিন হুহু করে নেমে যাচ্ছে। ব্যবসার পলিসি না বদলালে লালবাতি জ্বলতে বেশি সময় লাগবে না।'

রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে হেনরিকের মুখ। 'আমাকে কি তোমরা গাধা মনে করো? এমন সুরে কথা বলছ, যেন দুনিয়ার কোন খবরই আমি রাখি না। সব জেনেই বলছি, তোমাদের স্টাইলে ব্যবসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ কোম্পানিতে যতদিন থাকব, সমস্ত কাজ আগের নিয়মেই চলবে। সৎ থাকার কোন বিকল্প নেই, বেশি লাভ করার লোভে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে রাজি নই আমি,' কথা শেষ করে গটগট করে নিজের কামরায় চলে গেল সে।

জর্জ আর আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম। একটু হাসল সে। আমি ভুরু কুঁচকে তার চকচকে টাক দেখছি।

খানিক পর মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে সুটকেসটা খুলল জর্জ। আমার হাতে টাকার কয়েকটা বাণ্ডিল ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'কি যেন কিনবে বলছিলে, টাই? শোনো, বেতন বাড়ালে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়াতে হবে, কাজেই ওই ঝামেলায় আমরা যাচ্ছি না। টাকা দিলাম, হিসাবটা কোন একভাবে মিলিয়ে রেখো।'

জর্জ আর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। এপ্রিলের শেষ তো, অবেলার রোদে এত তেজ যে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তবু আমাদেরকে যেতে হবে। প্রথমত খিদে পেয়েছে, তার ওপর জর্জ ভয় দেখিয়ে বলেছে, 'পৌঁছাতে দেরি করলে ঠকতে হবে। কারণ ভালহাল্লায় গুলাশ বানিয়েছে। হ্যাঁ, আজও। দেরি করলেই একটা অজুহাত পেয়ে যাবে এডওয়ার্ড। শয়তানটা বলবে–আর নেই, ফুরিয়ে গেছে।'

'আজও গুলাশ বানিয়েছে তা তুমি জানলে কিভাবে?' কৌতূহলী না হয়ে পারি না আমি।

'ব্যাংক থেকে ফেরার পথে ভালহাল্লায় একবার উঁকি দেব না, এ তুমি ভাবতে পারলে?' হেসে উঠল জর্জ। 'তবে না, এডওয়ার্ডের চোখে ধরা পড়িনি।'

প্রথমে ঠিক করেছিলাম আগে টাই কিনব, তারপর ভালহাল্লায় যাব। সিদ্ধান্ত বদলাতে হলো। গুলাশ খাবার পরও টাইয়ের দোকান খোলা পাব। তাছাড়া, আরও বড় কথা, মার্কের দাম আজ আর পড়বে না। শনিবারে তো রেডিওর শেষ বিজ্ঞপ্তি দুপুরেই। সোমবার সকালের আগে মার্ক বা ডলার সম্পর্কে নতুন কোন খবর প্রচার মাধ্যমে থাকবে না।

হ্যাঁ, খাওয়ার পরও টাই কেনা যাবে। কিন্তু টাই কিনতে দেরি করে ফেললে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুলাশ খাওয়া হবে না। ভালহাল্লায় খদ্দেরদের বেজায় ভিড়, আমরা পৌঁছাবার আগেই চেটেপুটে শেষ করে ফেলবে সব। গুলাশের খদ্দের মাত্রই মারমুখো, প্রয়োজনে রক্তারক্তি করতেও পিছপা হবে না কেউ।

ভালহাল্লার প্রতিভাবান নেপথ্য-কর্মীদের প্রশংসা না করে উপায় নেই। অর্থাৎ বাবুর্চিদের কথা বলছি আর কি। কুচি কুচি করে কাটা মাংসে পিঁয়াজ, রসুন, আদা, ভিনিগার সহ আরও চেনা-অচেনা ডজনখানেক মশলা মিশিয়ে যে ঝোলটা তৈরি করে ওরা, তার বুঝি সত্যি কোন তুলনা নেই। ভালহাল্লা ছাড়া অন্য কোথাও এর স্বাদ পেতে হলে একটা জায়গারই নাম করতে হবে, সেটা হলো বেহেশত। মহাযুদ্ধের পর গর্ব করবার মত আর কিছু কি আছে জার্মানির? নেই, এক এই ভালহাল্লার গুলাশ ছাড়া। কাজেই, জর্জ ভাই, তাড়াতাড়ি চলো যাই! শয়তান এডওয়ার্ড সব গুলাশ বেচে দেয়ার আগেই পৌঁছাতে হবে আমাদের।

পাঠকের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে: আমরা পয়সা দেব, এডওয়ার্ড গুলাশ দেবে। প্রচলিত বিনিময় প্রথা। এর মধ্যে কি এমন জটিলতা আছে যে কথায় কথায় এডওয়ার্ডকে শয়তান বলতে হবে?

বলে রাখা ভাল, এই তিক্ত ও আপত্তিকর সম্বোধন একতরফা নয়। এগুলো তো বটেই, এরচেয়েও মারাত্মক বিশেষণ আমাদের বিরুদ্ধে হরহামেশা ব্যবহার করছে এডওয়ার্ড। খবরের তো ডানা থাকে, আমাদের কানেও সে-সব পৌঁছায় বৈকি।

পরস্পরকে এই যে আমরা গালমন্দ করি, এর পিছনে অবশ্যই একটা কারণ আছে। তাহলে খুলেই বলি। মার্কের অধঃপতন যুদ্ধের পর থেকে শুরু হলেও, এতদিন সহ্যসীমার মধ্যেই ছিল, তাই মানুষ আতঙ্কিত হয়নি। বিপর্যয়টা মারাত্মক রূপ নিয়েছে এই দশ থেকে বারো মাস আগে। সে যে কতটুকু মারাত্মক, কোন ভাষাতেই তার বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়।

ঘটনার যখন শুরু, বিপর্যয়টা তখনও এখনকার মত মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়নি। ভালহাল্লার মালিক এডওয়ার্ডের উর্বর মাথায় বুদ্ধি গিজগিজ করছে, তাই খদ্দের ধরার আশায় সে এক ফন্দি বের করল। কি ফন্দি?

এডওয়ার্ড কুপন সিস্টেম চালু করল। একটা খাতায় দশটা কুপন। সকাল, দুপুর, বিকেল—প্রতি বেলা খাও, খাতা থেকে একটা কুপন ছিঁড়ে ফিরিয়ে দাও এডওয়ার্ডকে। ব্রেকফাস্ট হোক, লাঞ্চ হোক বা ডিনার হোক, কুপন দিতে বাধ্য সে। নিয়ম বদলাতে পারে শুধু কোন কোন রাতের বিশেষ নৈশভোজে, তখন এডওয়ার্ড কুপন নিতেও পারে, আবার না-ও নিতে পারে। কারণ হলো, ওই বিশেষ নৈশভোজের সঙ্গে অনেক রকম দামী মদ থাকে, তার দাম কুপনের ওই আট মার্কে আদায় হয় না।

এবার আসল রহস্যটা বলে ফেলি। শুরু থেকেই আমি আর জর্জ কুপন কিনছি। জর্জের অবশ্য মা আছেন, তিনি রান্নাবান্নাও করেন, তবে শুধু নিজের জন্যে। তাই জর্জ আর হেনরিককেও আমার মত বাইরে খেতে হয়। তবে মাঝে মধ্যে মায়ের হাতের কফি বা ভাল-মন্দ দু'একটা খাবার ছেলেদের কপালে জোটে বৈকি। সে-সব জর্জ পেলে তা থেকে এই অধমও একটু ভাগ পাই। ভাজাভুজি বা

www.BanglaBook.org

চাটনি, যাই খাই, দিন কয়েক তার স্বাদ লেগে থাকে জিভে। ফ্রাউ ক্রল নিজেও বোধহয় জানেন না রান্নার হাত তাঁর কত ভাল। জানলে কি আর ছেলেদেরকে এভাবে বঞ্চিত করতে পারতেন! ঠিক আছে, ও-সব কথা থাক।

যা বলছিলাম। শুরু থেকেই এডওয়ার্ডের কুপন কিনছি আমরা। সিস্টেমটা চালু হবার কিছুদিন পর থেকেই মার্কের অধঃপতন শুরু হলো। এডওয়ার্ড হিসেব কষে দেখল, মাত্র আট মার্কের লাঞ্চ বা ডিনার খাওয়ানো এখন আর সম্ভব নয়। এভাবে চললে তার ব্যবসা লাটে উঠবে। নতুন বুদ্ধি বের করল সে—কুপন বেচা বন্ধ করে দিল। আগে যেগুলো বাজারে ছাড়া হয়েছে তার দায় এড়াবার কোন উপায় নেই, তবে নতুন কুপন আর ছাড়ল না।

সে-সময় ভালহাল্লার রান্নাঘরে যারা কাজ করত তাদের মধ্যে জর্জের পরিচিত কয়েকজন লোক ছিল। গোপন তথ্য ফাঁস করার সন্দেহে এডওয়ার্ড তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার সন্দেহ অবশ্য মিথ্যে নয়, কয়েকজন বাবুর্চি সত্যি সত্যি জর্জকে গোপন তথ্য জানিয়ে দিয়েছিল। সেই তথ্যের মধ্যে এটাও ছিল—এডওয়ার্ড কুপন বেচা বন্ধ করে দেবে।

বাবুর্চিদের মুখে এই কথা শুনে আমি আর জর্জ তৎপর হয়ে উঠি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যার কাছে যত কুপনের খাতা আছে সব আমরা ঝটপট কিনে ফেললাম। এক পর্যায়ে আমাদের হাতে সত্তরটা খাতা জমে গেল। এবং তারপর কি হলো? তারপর সত্যি সত্যি ভালহাল্লার কুপন বেচা বন্ধ করে দিল এডওয়ার্ড।

কুপন বেচা বন্ধ হতে খদ্দেররা পড়ল বিপদে। মাত্র আট মার্কে যে খাবার খাচ্ছিল তারা তা খেতে এখন তাদেরকে খসাতে হচ্ছে হাজার হাজার মার্ক। প্রতিটি খদ্দেরকেই এই চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে, ব্যতিক্রম শুধু আমি আর জর্জ।

কারণ জর্জ ক্রল আর লাডউইগ বডমার বাজার থেকে সমস্ত কুপন কিনে নিয়েছে। ওরা দু'জন যেন কুপনের অফুরন্ত উৎস। দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস পার হয়ে যাচ্ছে, ওদের কুপন আর শেষ হয় না। ওরা হাসতে হাসতে আসে, খেতে খেতে হাসে, খাওয়া শেষ করে চলে যাবার সময় খাতা থেকে একটা কুপন ছিঁড়ে ছুঁড়ে দেয় এডওয়ার্ডের মুখের ওপর। প্রতিটি কুপনে এডওয়ার্ডের নাম আর তার দেয়া প্রতিশ্রুতি জ্বলজ্বল করছে। এডওয়ার্ড 'নেব না' বলবে, সে উপায় নেই। তার বুক ফাটে, কিন্তু মুখ ফোটে না। রাগ হয়, কিন্তু রাগ প্রকাশ করতে পারে না। তবে, কতদিন সহ্য করে বেচারা। আক্রোশে দিশেহারা বোধ করে সে। আভাসে ইঙ্গিতে বলতে চায়, কুপনগুলো জাল হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তার কথায় আমরা কান দিই না। আমরা নিয়মিত আসি, খাই, বিনিময়ে এডওয়ার্ডের মুখে কুপন ছুঁড়ে মারি।

কোন কোন দিন খেঁকিয়ে ওঠে এডওয়ার্ড। 'কি পেয়েছ তোমরা? এত কুপন পাচ্ছই বা কোথায়?'

আমরা হাসি। কখনও আমি জবাব দিই, কখনও জর্জ মুখ খোলে। 'হিসাবটা তো তোমারই ভাল জানার কথা। যে ক'টা কুপন বাজারে ছেড়েছিলে তার সঙ্গে ফিরে পাওয়া কুপন বিয়োগ করো। যেগুলো এখনও ফেরেনি, ধরে নাও তার সবই আমাদের বাক্সে যত্ন করে সাজানো আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এডওয়ার্ডের সঙ্গে এই নিয়েই চলছে আমাদের খালি হাতের লড়াইটা। বেশ কয়েক মাস ধরেই চলছে। জোচ্চোর, জালিয়াত, দানব, পিশাচ–সে আমাদেরকে কিছুই বলতে বাকি রাখে না। আমরা তাকে অসৎ, লোভী, পাজি, শয়তান ইত্যাদি বলি। অবশ্য সামনাসামনি বলি না। মাঝে মধ্যে খুব বেশি ঝামেলা পাকাতে চেষ্টা করে এডওয়ার্ড। সেজন্যে দু'একবার সঙ্গে উকিল নিয়ে গুলাশ খেতে যেতে হয়েছে আমাদেরকে।

আমাদের উকিলটাও খুব ভোজনরসিক। এডওয়ার্ডের গুলাশেই আয়েশ করে চুমুক দিতে দিতে এডওয়ার্ডকেই জ্ঞানদান করেছে সে, প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছে কুপন মানে হলো এক ধরনের চুক্তিপত্র। চুক্তিপত্রের মর্যাদা রক্ষা করা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্যে বাধ্যতামূলক। কুপন হলো খেতে দেয়ার শর্তে আগেই দাম আদায় করার প্রমাণপত্র। এডওয়ার্ডকে উকিলের মুখে এ-ও শুনতে হয়েছে যে চুক্তিভঙ্গ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। জ্ঞানদান অধিবেশন শেষ হতে বেচারাকে আমরা তিনটে কুপন দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমরা যখন বেরিয়ে আসছি, এডওয়ার্ডকে দেখে মনে হচ্ছিল সে না কেঁদে ফেলে। তখন সত্যি তার জন্যে মায়া হচ্ছিল আমার।

কিন্তু মায়া হলে কি হবে, লোকটা আসলেই শয়তান। শয়তান যে, তার প্রমাণ হলো–সেটা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে হলে নতুন আরেকটা অধ্যায় শুরু করতে হয়।

দুই

হোটেল ভালহাল্লার বিশাল ডাইনিং রুমে আমরা ঢুকতেই এডওয়ার্ড এমন মুখ বাঁকাল, যেন কাটলেটের বদলে বুলেট চিবিয়ে ফেলেছে।

'সব খবর ভাল তো, হের এডওয়ার্ড? অমায়িক হেসে জানতে চাইল জর্জ। 'আবহাওয়াটা কেমন ঝরঝরে, খেয়াল করেছ? খিদে পায়, এরকম আবহাওয়ায় একেবারে রাক্ষসের মত খিদে পায়।'

এডওয়ার্ডকে একটা দৈত্য বললেই হয়। আমার চেয়েও আধ হাত বেশি লম্বা, চওড়ায় আমার তিনগুণ। মাথায় বাদামী হ্যাট, গায়ে ঢোলা ডিনার কোট, ডাইনিং হলে পায়চারি করছে। জর্জ রাক্ষুসে খিদের কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো তার। 'খিদে পেলেই খেতে হবে, এটা কোন যুক্তির কথা নয়। বেশি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।'

'তোমার হোটেলের রান্নার বেলায় কথাটা সত্যি নয়,' বলল জর্জ। 'এখানকার দুপুরের খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে রীতিমত উপকারী।'

জর্জের কথা এডওয়ার্ড কানে তুলবে কেন? সে আপনমনেই বলে যাচ্ছে, 'অনেক গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মাংস খাওয়াটা, মানে খুব বেশি মাংস খাওয়াটা...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এডওয়ার্ডের পেটে মৃদু চাপড় মারলাম আমি। এটুকু আদর করবার অধিকার আমার অবশ্যই আছে। কারণ দু'জনেই আমরা কাব্যচর্চা করি, প্রায় একই সময়ে নাম লিখিয়েছি কবি-সংসদে। আমরা, কবিরা, মাঝে মধ্যে এই ভালহাল্লা হোটেলে সংসদের অধিবেশন ডাকি।

না, বেশি কিছু নয়, মৃদু ও নরম একটা চাপড় মাত্র। কিন্তু তাতেই এডওয়ার্ড এমন চমকে উঠল, ঝট করে এমন ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল, যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। তার চমক ও লাফ দেখেও না দেখার ভান করে ম্লান সুরে আমি তাকে বললাম, 'দেখো বন্ধু, আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। মেনে নাও, ভাই, ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করো–তাতেই নিজের মঙ্গল ও মনের শান্তি খুঁজে পাবে। তবে, যদি জিজ্ঞেস করো, একটা আশ্বাস তোমাকে আমরা অবশ্যই দিতে পারি, তা হলো–সস্তায় খেয়ে খেয়ে তোমার ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালাবার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। এ প্রসঙ্গ বাদ দাও, এখন বলো দেখি লেখালেখি কেমন চলছে? নতুন কবিতা-টবিতা কিছু লিখলে?'

'কবিতার দিন শেষ। যে দুঃসময় চলছে, কবিতা কি আসে?'

ইতিমধ্যে চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝে নিয়েছি, যা খুঁজছি তা পাব না। 'কি ব্যাপার হে, একটা টেবিলও তো খালি দেখছি না!'

এডওয়ার্ডও দ্রুত চারদিকে চোখ বোলাল। 'আরে, তাই তো, দোস্ত!' চাপা হাসিতে চকচক করছে তার চোখমুখ। 'টেবিল যে খালি নেই, এতক্ষণ সেটা সত্যি আমি খেয়াল করিনি। সরি, দোস্ত।'

'কেন, এর মধ্যে তোমার দুঃখিত হবার কি হলো?' জিজ্ঞেস করলাম। 'টেবিল খালি নেই, খালি হবে। আমাদের কোন তাড়া নেই, আমরা অপেক্ষা করব।'

আরও একবার চারদিকে চোখ বোলাল এডওয়ার্ড। চেহারাই বলে দেয়, মনের আনন্দ চেপে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। 'অপেক্ষা করতে চাও করো, কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে না যে আজ কোন টেবিল খালি পাবে। শুধু তোমরা তো না, আরও মানুষ এসে দাঁড়িয়ে আছে, টেবিল খালি হলে ওরাই আগে দখল করবে। দোস্ত, তোমরা এক কাজ করো না–আজকের মত রেলওয়ের হোটেল বা আলস্ট্যাডার হফ-এ চলে যাও। লোকে বলে ওরাও নাকি বেশ ভালই খাওয়ায়।'

আমরা বেকায়দায় পড়েছি ভেবে মজা পাচ্ছে এডওয়ার্ড। অন্য কোথাও খেতে যাব? ভালহাল্লার গুলাশ ছেড়ে? অসম্ভব! ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় তা-ও করব, তবু অন্য কোথাও যাবার কথা আমরা ভাবতে পারি না। গুলাশ বলে কথা, এত ভাল জিনিস অন্য কোথাও তো নয়ই, এমন কি এই ভালহাল্লাতেও পাওয়া যাবে না। শুনেছি ভালহাল্লা শব্দটা নাকি নরওয়ে থেকে আমদানি হয়েছে, এর অর্থ নাকি স্বর্গ। ভালহাল্লার মানে যদি স্বর্গই হয়, বলতে হবে এডওয়ার্ড তার হোটেলের সার্থক নামই রেখেছে।

এ-সব কথা মনে মনে ভাবছি, হঠাৎ শুনি এডওয়ার্ড আমাদেরকে ভাগাবার মতলব করছে। লোকটা কবিতা লেখে কিনা, তাই বোধহয় মানুষের মনের কথাও পড়তে পারে! সে বলছে, 'এখানে সময় নষ্ট করাটা তোমাদের বোকামি হবে, দোস্ত। যতটুকু গুলাশ আছে, যারা বসেছে তারা কি তা শেষ না করে উঠবে

www.BanglaBook.org

ভেবেছ? শালার এই ডিশটা যতই রাঁধি, কোনমতেই কুলাতে পারি না। তবে, তোমরা যদি রোস্ট খেতে চাও তাহলে আলাদা কথা–এই কাউন্টারে দাঁড়িয়েই সেটা সেরে নিতে পারো।'

'গুলাশের বদলে রোস্ট খাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল,' বললাম আমি। তারপর খেপে উঠলাম। 'কি বললে? গুলাশ শেষ হয়ে যাবে? তা হয় হোক, তোমার পেটের মাংস কেটে গুলাশ বানিয়ে নেব।'

'সত্যি নাকি?' এডওয়ার্ডের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি।

'সত্যি কিনা সময় হলেই দেখতে পাবে,' বলে তার পেটে আরও একটা চাপড় মারি। পরমুহূর্তে গলা চড়িয়ে বলি, 'পেয়েছি, জর্জ! পেয়ে গেছি! টেবিল খালি হয়েছে...'

'কোথায়? নাহ্...কই?' এডওয়ার্ড আবার যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে।

'ওদিকে তাকাও, হ্যাঁ, ওদিকে। ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছ? লাল চুল? সার্টিনে ভেলভেটে মোড়া? পাশে সুন্দরী এক মহিলা? ওই দেখো, আমাদেরকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে। চিনতে পারছ না? আমার বন্ধু! উইলি! আমরা একই ফ্রন্টে লড়াই করেছি। এডওয়ার্ড, তাড়াতাড়ি ওদিকে একজন ওয়েটারকে পাঠাও। আমরা অর্ডার দেব।'

'হুস্-স্স্স্!' মনে হতে পারে কোথাও টায়ার ফাটল, আসলে ওটা এডওয়ার্ডের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করার আওয়াজ।

উইলি সত্যি আমাদেরকে স্বাগত জানাবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। খুবই উন্নতমানের কাপড়ে তৈরি সবুজ রঙের পরিচ্ছদের এমনই বাহার, তাকে দেখতে লাগছে ঠিক লাল টোপর পরা গেছো ব্যাঙ। টাইয়ে গাঁথা মুক্তোটা দৃষ্টি কাড়ে। ডান হাতের তর্জনীতে মস্ত একটা সোনার আঙটি। পাঁচ বছর আগের কথা, ফ্রন্ট লাইনে আমরা যারা যুদ্ধ করতাম তাদেরকে রেঁধে খাওয়াত সে। অর্থাৎ বাবুর্চি ছিল। আমরা সমবয়েসী।

টেবিলে এক সুন্দরী বসে আছে, তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল উইলি। তারপরই শুনতে পেলাম আশ্চর্য কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর। কার গলা বলতে পারব না। শুধু টের পেলাম সে গলায় এত জোর, গোটা ডাইনিং হল যেন কেঁপে উঠল।

'সুপ লাগাও, গুলাশ লাগাও, আর দাও দু'জনের মত মাংসের রিস্কুট। জলদি করো! দেরি করলে ঘুসি মেরে আমি তোমার কানের পর্দা ফাটিয়ে দেব...'

তাকিয়ে দেখি, এডওয়ার্ড ছুটে আসছে। কি ঘটছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। এসেই প্রথমে টেবিলের তলাটা পরীক্ষা করল। কিন্তু সেখানে কেউ নেই।

তাহলে কি ভূত চেঁচাল? কিন্তু ভূতই যেখানে নেই, সেখানে তার গলা থাকে কিভাবে? আর যদি থাকতও, তার পক্ষে কি ওরকম বাঘের মত গর্জে ওঠা সম্ভব ছিল? বাকি থাকলাম আমরা। কিন্তু আমাদের গলা তো এডওয়ার্ড চেনে। তাহলে কে চিৎকার দিল? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন চালাকি আছে। দু'কোমরে হাত রেখে সাবধান করে দিল এডওয়ার্ড, 'এটা ভদ্রলোকদের হোটেল। এখানে আমি কোন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রকম চিৎকার-চেঁচামেচি সহ্য করব না!'

তার কথা সবাই শুনল। কিন্তু কে উত্তর দেবে? কথাটা কার গায়ে লাগল? তার মত আমরাও তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সে-ই এই রহস্যের সমাধান করবে, এই আশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছি। উইলির সঙ্গিনী রেনিদ্য-লা-ট্যুর আপনমনে নিজের নাকে পাউডার মাখছে। আমাদের দিকে পিছন ফিরল এডওয়ার্ড। সে চলে যাচ্ছে।

'হোটেলঅলা! এই হোটেলঅলা! যাচ্ছ কোথায়? এদিকে এসো!' আবার বিস্ফোরিত হলো সেই বোমা। একটা বোমা বললে ভুল হবে, প্রতিটি শব্দ একটা করে আলাদা বোমা। যতবার ফাটল, প্রতিবার কেঁপে উঠল ডাইনিং হল।

ক্ষিপ্রবেগে আধ পাক ঘুরল এডওয়ার্ড। হাঁ করে তাকিয়ে আছে। আমরা কি করছি? বোকা বোকা হাসছি। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। সুন্দরী রেনির ওপর দৃষ্টি হানল সে। 'এই মাত্র আপনিই কি–?'

ক্লিক করে পাউডার কেসটা বন্ধ করল রেনি। 'আমাকে কিছু বললেন আপনি?' এমন সুরেলা কণ্ঠস্বর, যেন কোকিল ডেকে উঠল। 'হ্যাঁ, প্লীজ বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি?'

এডওয়ার্ডের হাঁ আরও বড় হলো। রহস্যটা তার মাথায় ঢুকছে না।

সহানুভূতি প্রকাশের জন্য হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল জর্জ। নরম সুরে বলল, 'হের এডওয়ার্ড, এটা অন্যায়–তুমি অন্য লোকের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগো, অথচ নিজে যে খেটে খেটে অসুস্থ হয়ে পড়ছ সেদিকে খেয়াল নেই। এত খাটলে মাথা ঘুরবে, দৃষ্টিভ্রম হবে, শ্রবণবিভ্রাটও ঘটতে পারে।'

'কিন্তু আমি শুনলাম এইমাত্র কেউ...'

'লক্ষণ মোটেও ভাল নয়, এডওয়ার্ড,' এবার আমার খোঁচা দেয়ার সুযোগ। 'তুমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছ। অন্তত চেহারা দেখে তোমাকে পাগল পাগলই লাগছে। নিজের ভাল চাও তো দিন কয়েক ছুটি নিয়ে কোথাও থেকে বেড়িয়ে এসো, তা না হলে কিন্তু হঠাৎ ঠাস করে একদিন পটল তুলবে। তখন তোমার আত্মীয়রা ছুটে আসবে আমাদের কাছে, আমরাও তোমার কবরে বসাবার মত একটা স্মৃতিফলক বিক্রি না করে পারব না। অবশ্য খুবই সস্তা একটা ফলক আছে বটে আমাদের দোকানে। আসল নয়, নকল মার্বেল। ওটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে, কারণ তোমার জন্যে দামী ফলক কে আর কিনতে যাবে।'

ভাষা হারিয়ে বোবা হয়ে গেছে এডওয়ার্ড। চোখ পিটপিট করছে যেন একটা বুড়ো প্যাঁচা।

বাঁশীর মিষ্টি-মিহি সুরে রিনি বলল, 'আপনি তো দেখছি আজব মানুষ! ওয়েটাররা কানে শোনে না, সে দোষ কি আপনি খদ্দেরদের ওপর চাপাবেন?' খিলখিল করে হেসে উঠল সে, 'আমাদের সবার কানে তো মধুবর্ষণ করল।'

এডওয়ার্ড সত্যি সত্যি অসুস্থ বোধ করছে। কপালের দু'দিক দু'হাতে চেপে ধরেছে সে। এরকম ধাঁধায় জীবনে বোধহয় আগে কখনও পড়েনি। ওই সুন্দরী তরুণীর গলা থেকে বাঘের গর্জন বেরিয়েছিল? এ তো পাগলও বিশ্বাস করবে না। রিনিঝিনি মিষ্টি হাসি আর বাঘের গর্জন, একই কণ্ঠ এরকম বিপরীতধর্মী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আওয়াজের উৎস হতে পারে না।

দরাজ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তাকে বিদায় করতে চাইছে জর্জ। 'এখানে তোমার কোন কাজ নেই, কাজেই তুমি যেতে পারো। তবে যদি আমাদের সঙ্গে বসে খোশগল্প করতে চাও, একটা চেয়ার আনিয়ে নাও। আমরা বসে আছি, তুমি দাঁড়িয়ে আছ, লজ্জা পাচ্ছি...'

উপদেশ দেয়ার সুরে বললাম আমি, 'তোমার, বুঝলে এডওয়ার্ড, মাংস একটু কম খাওয়া উচিত। তুমিই তো বলছিলে মাংস খাওয়া, বেশি মাংস খাওয়া, স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমার মতে, বেশি মাংস খেলে মানুষ পাগলও হয়ে যেতে পারে।'

আমাদের দিকে পিছন ফিরে এক রকম দৌড়ই দিল এডওয়ার্ড। তাই দেখে বিশাল ভুঁড়ি দুলিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল উইলি। রেনি-দ্য-লা-ট্যুর ঠোঁটে মৃদু হাসি, চোখে ঝিলিক মারছে কৌতুক।

'ভাই উইলি,' বললাম আমি, 'এমন মজা অনেকদিন পাইনি। কিন্তু রহস্যটা কি বলো তো?'

উইলির কাছে ব্যাপারটা যেন খুবই সহজ আর স্বাভাবিক। সে শুধু বলল, 'ওদেরকে বলে দাও, লোটি।'

'বলবার আর কি আছে!' গলার আওয়াজ এবার চাপা, কিন্তু তাসত্ত্বেও যেন কানের পাশে গুরুগম্ভীর মেঘ ডেকে উঠল।

আমি আর জর্জ চমকে উঠলাম।

উইলি হাসতে হাসতে জানাল, 'এবার বুঝেছ তো? ওর দুই গলা। কেন, ওর গ্রামোফোন রেকর্ড শোনোনি তোমরা? একজন মানুষ দু'রকম কণ্ঠে কথা বলে? ওর সবচেয়ে জনপ্রিয় রেকর্ড হলো—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। লাখ লাখ পাউণ্ড আয় হয়েছে।'

তিন

রোববার সকাল, গির্জায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। সৌখিন সমাজের বাসিন্দারা শনিবার রাতে বহুবিধ কামজ দোষে আক্রান্ত হয়েছিল, তাই অবশ্য শরীরগুলোকে বিছানা থেকে টেনে তুলতে সফল হচ্ছে না। অবশ্য গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে তাদের চিত্ত চঞ্চল হবার কোন কারণ নেই, কেননা ডলারই তাদের ঈশ্বর।

সকালে উঠেই খবর নিয়েছি আমি, ডলার এখনও সেই ছত্রিশ হাজারেই আছে। লাফটা দেবে কাল দুপুর নাগাদ, এক লাফে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কেউ তা বলতে পারে না। টাকার কারবারীরা আতঙ্কে দম বন্ধ করে আছে।

নির্মেঘ স্বচ্ছ আকাশে দিনের তাপ এখনও ছড়ায়নি। সকালটা এত পরিচ্ছন্ন, রীতিমত পবিত্র লাগছে। এরকম সকালেই মনটা প্রশান্তি ও প্রসন্নতায় এমন ভরাট হয়ে থাকে যে ইচ্ছা হয় খুনীকেও ক্ষমা করে দিই। পাপ ও পুণ্য, সৎ আর

www.BanglaBook.org

অসৎ—এ-সব শব্দ অর্থহীন মনে হয়, যেন কোন পার্থক্য নেই, ফাঁকা বুলি বৈ কিছু নয়।

ধীরেসুস্থে কাপড় পরছি। রোদের গন্ধমাখা বাতাস ঢুকছে খোলা জানালা দিয়ে। পাশের ঘরে করাত চালায় কে?

একটু পরই ভুল ভাঙল। ওটা করাতের দাঁত কিড়মিড় নয়, সুখ নিদ্রায় নিমগ্ন সার্জেন্ট-মেজর জর্জের নাক ডাকার আওয়াজ। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি এক ঝাঁক সোয়ালো পাখি উড়ে যাচ্ছে, গায়ে রোদ লাগায় একেকটা যেন ইস্পাতের ঝলক।

দোতলায় আমার এই ঘরে দুটো জানালা। পিছনের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের বাগানটা দেখছি। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা, সড়সড় করে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। তারপর চাপা গোঙানি আর হাত-পা ছোঁড়ার আওয়াজ ভেসে এল।

মুহূর্তের জন্যে আঁতকে উঠেছিলাম। কি ঘটছে বুঝতে পেরে বিষণ্নবোধ করি। এই চিৎকারটা প্রায়ই শুনতে হয়, কিন্তু অভ্যস্ত হতে পারিনি, যতবার শুনি ততবার চমকে উঠি। হেনরিকের এই দুঃস্বপ্ন উনিশশো আঠারো থেকে শুরু হয়েছে। সে-সময় একটা বিস্ফোরণের ফলে মাটির নিচে চাপা পড়েছিল সে। সেই আতঙ্ক আর কষ্ট আজ পাঁচ বছর পরও স্বপ্নের মধ্যে ভোগ করতে হয় তাকে।

স্টোভ জ্বেলে কফি বানালাম। কাপে খানিকটা কাশ ঢালা যেতে পারে। এটা আমার ফ্রান্স থেকে শেখা। বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে আমিও তো ছিলাম ওখানে। হয়তো ভাবছেন টাকার যেখানে এতটাই অবমূল্যায়ন, মদ কিনি কিভাবে? আসলে বেতনের টাকায় নতুন কাপড়চোপড় কেনা সম্ভব না হলেও, মদ কেনার মত ছোটখাট বিলাসিতা করা মাঝে মধ্যে সম্ভব। বেতন পেয়েই ওটা কিনে ফেলি, তারপর কোনভাবে মাসটা পার করে দিই। বাঁচার জন্যে দু'এক বোতল ব্র্যাণ্ডি তো না হলে চলে না।

রুটি খাচ্ছি, সঙ্গে বরুইয়ের চাটনি। ফ্রাউ ক্রল দয়া করে পাঠিয়েছেন এই চাটনি। একটু টক হয়ে গেলেও তাতে কিছু আসে যায় না। যুদ্ধের সময় কত অখাদ্যই তো মুখে দিতে হয়েছে।

খাওয়া শেষ হতে পোশাক দুটো নাড়াচাড়া করছি। দুটোই এক সময় সামরিক ইউনিফর্ম ছিল, দর্জিকে দিয়ে কাটছাঁট করিয়ে নিয়ে কাজ চালাচ্ছি। যুদ্ধের আগের সিভিল ড্রেসও একটা আছে, কিন্তু এখন আর গায়ে ফিট করে না। তা না করলেও মাঝে মধ্যে পরি, বিশেষ করে যদি জানা থাকে যেখানে যাচ্ছি সেখানে আলো খুব বেশি উজ্জ্বল নয়। পুরানো পরিচ্ছদের বদলে টাইটা পরলাম। কাল রাতেই কিনে ফেলেছি এটা। আগেই ঠিক করেছিলাম, আজ সকালে পরব। রোববার সকালে পাগলাগারদে যেতে হয় আমাকে। ওটা পাহাড়ের মাথায়। ঠিক পাগলাগারদে নয়, আমাকে যেতে হয় ওখানকার গির্জায়। না, গির্জায় আমি প্রার্থনা করতে যাই না। ওটা আসলে আমার পার্টটাইম একটা চাকরি। ওখানে আমি অর্গান বাজাই। বেতন নামেমাত্র, এক হাজার মার্ক। ডিউটি হপ্তায় একদিন, রোববার সকালে। শুধু বেতন নয়, সঙ্গে উপরি আছে কিছু। শুধু বেতন হলে এই

www.BanglaBook.org

চাকরি আমি করতাম না। বেতনের চেয়ে এই উপরিটাই আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়। সকালের উপাসনা শেষ হলে ওরা আমাকে নাস্তা খাওয়ায়। বেশ লোভনীয় আয়োজন, আর পরিমাণেও কম নয়।

পেট একেবারে খালি নয়, শহরের পথে হাঁটতে ভালই লাগছে। ওয়ার্ডেনব্রাক প্রাচীন শহর। ইদানীং লোকসংখ্যা বেড়েছে, সব মিলিয়ে ষাট হাজারের কম তো নয়ই। বেশিরভাগ সেকেলে ধাঁচের কাঠের বাড়ি, প্রতিটি বাড়ি ছবির মত সুন্দর। আধুনিক বাড়িগুলো শহরের সৌন্দর্য না বাড়িয়ে বরং কমিয়ে দিয়েছে। ভাল না লাগলেও কিছু করার নেই।

শহর পিছনে ফেলে একটা বাদামবীথির ভেতর দিয়ে হাঁটছি। সামনের ছোট পাহাড়টায় উঠতে হবে আমাকে। পথটা খুব একটা খাড়া নয়, চূড়াটাও সমতল। পাহাড়ের মাথায় ওই সমতল জায়গার পুরোটাই একটা বাগিচা। বাগিচার মাঝখানে আশ্রম। আশ্রম মানে পাগলাগারদ। গির্জাটা পাশেই।

এরকম পার্টটাইম চাকরি আরও কয়েকটা করি আমি। টাকার ধান্ধায় অনেক কিছুই করতে হয়। মুচি কার্ল ব্রিলও আমাকে ছোট্ট একটা চাকরি দিয়েছে। তার ডানপিটে চার ছেলেমেয়েকে পিয়ানো শেখাতে হয় আমার। ওই হপ্তায় একদিনই। বেতন, বলাই বাহুল্য, অতি সামান্য। তবে এখানেও উপরি পাওনা আছে। সেটা হলো, জুতো ছিঁড়লেই ব্রিল তা মেরামত করে দেয়, কোন পয়সা নেয় না। এমন কি প্রয়োজন হলে জুতোর তলা পর্যন্ত বদলে দেয়।

আরও একটা মাস্টারি আছে আমার। মি. বয়ার-এর গবেট ছেলেটাকে হপ্তায় দু'দিন পড়াতে যাই। মি. বয়ার একটা বুকস্টলের মালিক। তার ছেলেকে পড়াবার সুবাদে যখনই কোন বই কিনি, কিছু ছাড় পাই আমি। সুযোগটা আমার, তবে সেটা আরও অনেকে ব্যবহার করে। কবি সংসদের প্রায় সব সদস্যই আমার নাম করে মি. বয়ারের কাছ থেকে অতিরিক্ত ছাড় আদায় করে। এমন কি, পাজি এডওয়ার্ডও বাদ যায় না। তার যখন বই কেনার প্রয়োজন হয়, হঠাৎ আমার বন্ধু বনে যায় সে। ভালহাল্লায় বসে গুলাশের দাম হিসেবে তখন তাকে কুপন দিলে সে অসন্তুষ্ট হয় না, হাসি মুখেই সেটা নেয়।

সকাল ঠিক ন'টায় প্রার্থনা শুরু হলো।

অর্গানের কাছে বসে লক্ষ করছি, দরজা দিয়ে এখনও অনেক লোক ঢুকছে। কিছু লোক সব কাজেই দেরি করবে। শৃঙ্খলার এই অভাব যুদ্ধের আর দেখা দিয়েছে। নিয়ম মেনে চলার নিয়মটা আস্তে আস্তে উঠে গেছে সমাজ থেকে। তবে একটা জিনিস ভাল লাগে—কোন রকম হৈ-চৈ বা গোলমাল নেই। ভেতরে ঢোকার পর নিঃশব্দ পায়ে হাঁটছে সবাই, নীরবে এসে যে যার নিজের আসনে বসছে। শব্দ বলতে শুধু পাকা মেঝের সঙ্গে জুতোর ঘষা লাগার খসখস। তাও খুব অস্পষ্ট। সাবধানে পা ফেলছে সবাই। প্রার্থনা করতে এসে ধরিত্রীর বুকে কেউ আঘাত করতে চায় না।

যারা এল সবাই তারা পাগলাগারদের লোক। দু'চারজন পাহারাদার ও নার্স, বাকি সবাই রোগী। আমার সামনে দীর্ঘ কয়েক লাইনে বসেছে সবাই। প্রথম কয়েকটা সারির ওপর চোখ বোলালাম। ডানদিকে গোলাপী আর নীল চোখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়ল। ওই সম্ভবত ইসাবেল। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। ইসাবেলের কালো চুল দেখা যাচ্ছে।

নিজের আসনে হাঁটু গেড়ে বসেছে ইসাবেল, একহারা শরীরে কোথাও এতটুকু ভাঁজ পড়েনি। চোখ রেখেছি বলেই ব্যাপারটা ধরা পড়ল, আজ আমার বাজনা শুনেও এদিকে তাকাচ্ছে না ও। এর আগে লক্ষ করেছি, আমি বাজাতে শুরু করলেই মুখ উঁচু করে তাকাত। আজ যেন কি এক ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে ইসাবেল। একেবারেই কিছু দেখছে বা শুনছে না।

কিন্তু প্রার্থনা বা উপাসনা করছে বলেও মনে হলো না। সম্ভবত দূরে কোথাও, এমন কোথাও চলে গেছে ইসাবেলা, ওর পিছু নিয়ে সেখানে পৌঁছানোর সাধ্য কারও নেই।

প্রার্থনা পর্ব শেষ হলো। আশ্রমের নার্সরা আমাকে নাস্তা খাওয়াতে নিয়ে এল। আজও বেশ ভাল আয়োজন দেখলাম। রুটি, ডিম, মধু আর ঠাণ্ডা মাংস। আগেই বলেছি, এটা হলো উপরি পাওনা। নাস্তা করার এই সুযোগ আছে বলেই চাকরিটা নেয়া। তা না হলে যা বেতন দেয় তাতে বাস ভাড়াও হয় না। আমি অবশ্য বাসে চড়ি না, হেঁটেই আসি।

বেতন কম হলেও আশ্রম কর্তৃপক্ষকে আমি কখনও তা বাড়াতে বলি না। কেন যে বলি না নিজেও ভাল বুঝি না। মুচি ব্রিল আর বুকস্টলের মালিক মি. বয়ারের সঙ্গে তো বেতন নিয়ে মাঝে মধ্যেই বুনো ছাগলের মত গুঁতোগুঁতি করি।

নাস্তা করার পর বাগিচায় এক চক্কর ঘুরে আসা আমার একটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেছে। বেশ বড় বাগান, যত্ন করে সাজানো। গাছে গাছে প্রচুর ফুল ফুটে আছে। ঝোপ-ঝাড় বাড়তে দেয়া হয়েছে একটা উদ্দেশ্য আর শৃঙ্খলার আওতায়, বসবার বেঞ্চগুলো যাতে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। গোটা বাগিচাকে ঘিরে রেখেছে উঁচু পাঁচিল। জানালাগুলোয় লোহার গরাদ না থাকলে ভবন আর বাগিচাকে সৌখিন কোন ধনী লোকের বাগানবাড়ি বলে চালিয়ে দেয়া যায়।

এই বাগিচা আমার খুব ভাল লাগে। এখানে আমি নিরুপদ্রব শান্তি পাই। এখানে যারা আসে তারা আমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাবার জন্যে যুদ্ধ, রাজনীতি বা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনায় শরিক হবার আমন্ত্রণ জানায় না। শহরের যেখানেই আমি যাই, এসব বিষয়ে কথা না বললে আমাকে লোকে নির্ঘাত নির্বোধ মনে করবে। এই পাগলাগারদ আর সংলগ্ন বাগিচাই শুধু ব্যতিক্রম। এখানে কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না, নিজের মনে একা যতক্ষণ খুশি বসে থাকতে পারি আমি। বসে বসে গাছগাছালির সঙ্গে বাতাসের শনশন আলাপ শুনি, নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে দেখি বাগিচার গাঢ় সবুজ চাঁদোয়া ভেদ করে বিচিত্র সব বাহারি বর্ণের আলোকরশ্মি কি সুন্দর চুইয়ে পড়ছে নিচে। মনটা উদাস হয়ে যায়। নিজেকে জিজ্ঞেস করি, কে আমি? নিজের চারপাশে আমি যা দেখতে পাই, এসব কি? সত্যি জেগে আছি, নাকি গোটা ব্যাপারটাই মায়াবি এক স্বপ্ন? প্রকৃতি ভারি সুন্দর, তাহলে মানুষ কেন আরও সুন্দর হলো না? তার ভেতর এত কেন লোভ?

এ-সব সেকেলে দর্শন আর কাব্যচর্চা? জানি না, হবে হয়তো। যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম, ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে আধুনিকতার চরম দেখে এসেছি। আমার সেকাল-প্রীতি

www.BanglaBook.org

হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া।

আশ্রমের অনেক রোগীই বাগিচায় হাওয়া খেতে আসে। তবে কিছু রোগীকে বিল্ডিঙের বাইরে একেবারেই বেরুতে দেয়া হয় না। রোগ যাদের কঠিন নয়, স্বভাবের মধ্যে হিংস্রতা নেই, তারাই শুধু বেরুতে পারে। অবশ্য একা নয়, সঙ্গে নর্স বা গার্ড থাকে। এ-ধরনের রোগীরা বিশেষ নড়াচড়া করে না বা কথা বলে না, চুপচাপ বসে থাকে বেঞ্চে। তবে সবাই নয়। কেউ কেউ পাশে কাউকে পেলে চড়া গলায় ঝগড়া বাধিয়ে দেয়–তা সে আরেকজন রোগী হোক, নার্স হোক, গার্ড হোক বা বাইরের কোন লোক। তবে বেশিরভাগই কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে আসে, এসেই যেখানে খুশি বসে পড়ে, বসার পর আর নড়াচড়া করে না, যেন পাথরের একেকটা মূর্তি। যতক্ষণ কেউ তাদের কানে ফিসফিস না করবে 'এবার চলুন' ততক্ষণ তারা ওই একই ভাবে বসে থাকবে। 'চলুন' বললে ওঠে, একটা মৌন মিছিলের মত বিল্ডিঙে ফিরে যায়। ফেরার সময় দু'একজন দল থেকে খসে পড়ে, গার্ডরাই আবার তাদেরকে ফিরিয়ে আনে।

আমি ভাবি, ঘরে ফেরার পর কি করে ওরা? সেখানেও কি ঘাড় গুঁজে চুপচাপ বসে থাকে? নাকি স্বাভাবিক মানুষের মত হাঁটাচলা করে, কথা বলে, টুকটাক কাজ সারে? জানার কোন উপায় নেই। অন্তত আমার মত বাইরের লোকের নেই।

প্রতি মাসে চারবার দেখছি ওদের। অনেক দিন ধরে দেখছি তো, তাই ওদের এই করুণ অবস্থা আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। অথচ তবু মাঝে মধ্যে এখনও সেই প্রথম দিনের মত ব্যথায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এই পাগলদের দেখি আমি, চোখে পলক পড়ে না। শুধু যে ব্যথা পাই আর বিস্মিত হই তা নয়, আমার মনে কৌতূহলও জাগে, আবার আতঙ্কও বোধ করি। এ-সব ছাড়াও অন্য একটা অনুভূতি হয়। সেটা নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়, অস্পষ্ট একটা আবেগ। এই অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় হয় যেদিন প্রথম একটা মরা মানুষ দেখেছিলাম।

তখন আমার বারো বছর বয়স। হেলম্যান ছিল আমারই খেলার সাথী। সাতদিন আগে তার সঙ্গে খেলার মাঠে ছুটোছুটি করে খেলেছি, তারপর দেখলাম সে লাশ হয়ে পড়ে আছে। ফুল আর মালায় প্রায় ঢেকে ফেলা হয়েছে আমার অতি পরিচিত মানুষটাকে। সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলাম, চেনা মানুষ কতটুকু অচেনা হয়ে যেতে পারে। হেলম্যানকে আমার চেনাই মনে হচ্ছিল, কিন্তু তা শুধু চেহারার দিক থেকে, তা-ও আংশিক মাত্রায়। যতটুকু চেনা, তারচেয়ে অনেক বেশি অচেনা। কেন অচেনা লাগছিল তার কোন ব্যাখ্যা দেয়া সত্যি কঠিন। মানুষ প্রাণ হারালে তার সঙ্গে জ্যান্ত মানুষের যে পার্থক্য সূচিত হয় তা বর্ণনা করা সহজ কাজ নয়। আমি ঠিক বলতে চাইছি না যে দু'জন দুই জগতের বাসিন্দা। মৃত মানুষের জন্যে অন্য কোন জগৎ আছে কিনা আমার তা জানা নেই। হেলুদ মোম দিয়ে গড়া একটা পুতুল লাগছিল হেলম্যানকে। আমরা যারা জ্যান্ত মানুষ তাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাকে ভালবাসা যায় না, ঘৃণা করা যায় না। কোন সংশ্রবই তো নেই। পৃথিবীর সকল বাঁধন ছিন্ন করেছে সে। এই বাঁধন ছিঁড়ে কোথায় গেল হেলম্যান? তার যাত্রা নাকি অনন্তের পথে।

কি এই অনন্ত? সেদিন তা কল্পনায় ধরা দেয়নি। আজও ধরা দেয় না।

www.BanglaBook.org

আমার খুব ভয় লেগেছিল। সে যে কি রকম ভয়, বলে বোঝানো যাবে না। এই মৃত্যু যেন আমাকে তীব্র একটা ঝাঁকি দিয়ে জানিয়ে গেল, তোমারও এই পরিণতি হবে। পরিণতিটা যে ভয়ঙ্কর, এটা আন্দাজ করতে অসুবিধে হয়নি, কিন্তু কেন ভয়ঙ্কর তার কোন ব্যাখ্যা পাইনি। মৃত্যু কি অভিশাপ নয়? আবার, মৃত্যু কি নিষ্কৃতি নয়? আসলে অনেক ভাবেই দেখা যায় মৃত্যুকে, তবে কোন দেখাটা সঠিক তা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। হেলম্যান হারিয়ে গেছে, আমিও হারিয়ে যাব, এই চিন্তাটাই আমাকে ভীত করে তুলেছিল। জ্যান্ত মানুষ এত কাছের, এত আপন, অথচ মরা মানুষ কত দূরের, কত পর। আমার পরিচিত সবার কাছে আমি পর হয়ে যাব, তাদের সবার কাছ থেকে এত দূরে চলে যাব যে তারা ডাকলেও শুনতে পাব না, তাদেরকে দেখতে পাব না—এগুলোই ভয় পাইয়ে দেয় আমাকে। সেই ভয়ে জমে গিয়েছিলাম আমি।

পরে অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে চারদিকে অসংখ্য লাশ দেখেছি। কিন্তু সে-সব লাশ দেখে সেরকম ভয় কখনোই আমি পাইনি। সেই ভয়টা আজও আমার মনে আছে, ভুলিনি। তার সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কিছুই আমি এই পাগলাগারদে চাকরি নেয়ার আগে দেখিনি।

চাকরিটা নেয়ার পর থেকে প্রতি হপ্তায় সেই ভয়টা আবার আমি নতুন করে অনুভব করছি। শুধু যে নিজে অনুভব করছি তা নয়, এখানকার উন্মাদদের মধ্যেও তার আভাস পাচ্ছি। পাগলদের নিষ্প্রভ চোখের কোণে সেই আজব ভয়টা জমে থাকে, আমি অনুভব করতে পারি। হারিয়ে যাবার ভয়। নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয়। বেঁচে থেকেও মৃত, এই ভয়। প্রকৃত মৃত্যুর চেয়ে এই মরণ অনেক বেশি রহস্যময়, ভীতিকর ও দুর্বোধ্য।

ইসাবেল আসছে। আশ্রমে মেয়েদের জন্যে আলাদা মহল আছে, সেদিক থেকেই সোজা আমার দিকে হেঁটে আসছে। পোশাক পাল্টেছে ও। পরেছে হলুদ স্কার্ট। ওর দেহসৌষ্ঠবকে ঘিরে স্কার্টটা ফুলে ফুলে উঠছে বাতাসে। হাতে একটা খড়ের তৈরি চ্যাপ্টা হ্যাট।

বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়ালাম, ওর দিকে এগোচ্ছি। ইসাবেলের মুখটা সরু। তাকিয়ে থাকলে একজোড়া চোখ আর একজোড়া ঠোঁটই শুধু দৃষ্টি কাড়ে। ধূসর সবুজ চোখের রঙ। ঠোঁট এত লাল যে সন্দেহ হয় ওর বোধহয় যক্ষ্মা হয়েছে। কিন্তু ওর চোখের ওই ধূসর সবুজ রঙ মুছে যেতে দেখেছি আমি, তখন সেখানে ফুটে ওঠে স্লেট পাথরের কালচে রঙ; আর দেখেছি টকটকে লাল ঠোঁট কুঁকড়ে বাঁকা হয়ে গেছে। তখন ওকে দেখায় সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এক চিরকুমারীর মত, বুড়ি হতে আর বেশি বাকি নেই। আর তখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার নাম কি, ও জবাব দেয়, 'আমি জেনি।'

কিন্তু অন্য সময়, যখন হাসিখুশি থাকে, নিজের নাম বলবে ইসাবেল। আজ, এই মুহূর্তে, আমি উপলব্ধি করতে পারছি, ও ইসাবেল-জেনি নয়।

কিন্তু মেয়েটির আসল পরিচয় কি? ও তো ইসাবেল নয়, নয় জেনিও। দুটো পরিচয়ই ওর বানানো, কল্পনা থেকে পাওয়া। ওর আসল পরিচয়, প্রকৃত নাম, জেনেভিব টারোভান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর হাসিখুশি চেহারাটাই আমি দেখতে চাই। তাই ওর ইসাবেলা পরিচয়টাই পছন্দ করি। ইসাবেলের রোগটা বেশ জটিল। শুধু উন্মাদ বললে ওর রোগ সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না। রোগটার একটা নাম আছে—সিজোফ্রেনিয়া। প্রচলিত ভাষায় বলা হয়, বিভাজিত ব্যক্তিত্ববোধ। এই রোগের লক্ষণ হলো, রোগী মাঝে মধ্যে নিজের পরিচয় ভুলে যায়, নিজেকে অন্য মানুষ হিসেবে কল্পনা করে। শুধু নিজেকে নয়, চেনা মানুষদেরও পরিচয় ভুলে গিয়ে অন্য মানুষ হিসেবে কল্পনা করে, তাদের ওপর আরোপ করে কল্পিত ব্যক্তিত্ব। এভাবে আলাদা একটা কল্প-জগৎ তৈরি করে নিজের চারপাশে। সে জগতে নিজেকে ও অন্যদেরকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করায়।

এ-সব আমাকে জেনেভিব ওরফে জেনি ওরফে ইসাবেল বলেনি, বলেছেন ডাক্তার ওয়ার্নিক। তিনিই এই পাগলাগারদের আবাসিক চিকিৎসক। রোগীদের সমস্ত দায়িত্বই তাঁর ওপর। একাধারে তিনি রোগীদের চিকিৎসক, বন্ধু ও অভিভাবক। পদমর্যাদায় তাঁর চেয়ে বড় একজন কর্মকর্তা আছেন বটে, তিনিও ডাক্তার, কিন্তু ভদ্রলোক আশ্রমে তো নয়ই, এমন কি ওয়ার্ডেনব্রাকেও থাকেন না। তিনি থাকেন বার্লিনে। ওয়ার্নিক তাঁকে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠান। সে-সব রিপোর্ট দেখে, যদি ইচ্ছে করেন, মাঝে মধ্যে ডাক্তার ওয়ার্নিককে নির্দেশ বা উপদেশ দেন তিনি। ব্যস, এইটুকুই তাঁর সংশ্লিষ্টতা। যেহেতু বার্লিনেই তিনি প্র্যাকটিস করেন, নিজের রোগীদের ফেলে এখানে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে এখানকার পাগলাগারদ থেকে কর্তৃপক্ষ যদি কোন জটিল রোগীকে বার্লিনে পাঠান, তাঁর চিকিৎসা তিনি যত্ন নিয়েই করেন। সেজন্যে আলাদা বা অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না।

আবার আগের কথায় ফিরে আসি। ডাক্তার ওয়ার্নিকই এখানকার কর্তাব্যক্তি। তাহলে প্রশ্ন একটা উঠতেই পারে, আমি এমন একটা অধম যার বেতন ডাক্তার ওয়ার্নিকের আর্দালির সমানও নয়, তাকে ডাক্তার ওয়ার্নিক কি কারণে জেনেভিব টারোভান সম্পর্কে এত কথা বলতে গেলেন? বলবার মত পরিবেশই বা তিনি পেলেন কোথায়?

অনেক প্রশ্নের মধ্যে এই শেষ প্রশ্নটার উত্তর দেয়াই সবেচেয় সহজ, আর সেই উত্তরটা পেয়ে গেলে বাকি সব প্রশ্নের উত্তরও প্রশ্নকর্তা আংশিক হলেও পেয়ে যাবেন।

পরিবেশটা তৈরি হয় নাস্তার টেবিলে।

আগেই বলেছি, রোববারে প্রার্থনার পর সকালের নাস্তাটা আমি আশ্রমেই খাই। হপ্তায় ওই একদিন নিয়মিতই ডাক্তার ওয়ার্নিকের সঙ্গে দেখা হয় আমার। বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করেন, সেই প্রথম থেকে। এর পিছনে স্পষ্ট কোন কারণ আছে কিনা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। তবে আমি একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। ডাক্তার ওয়ার্নিক জানেন যে আমি টানা চার বছর ট্রেঞ্চে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি, এবং এরকম একটা যুদ্ধের পরও সুস্থ মানুষের মন-মানসিকতা নিয়ে সভ্যসমাজে ফিরে এসেছি স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করবার জন্যে। ডাক্তারের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা হয়তো অসাধারণ বলে মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছে।

গল্পচ্ছলেই ডাক্তার ওয়ার্নিক একদিন নাস্তার টেবিলে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন সিজোফ্রেনিয়া রোগটা আসলে কি রকম। তারই সূত্র ধরে উঠল জেনেভিব টারোভানের কথা।

অভিজাত পরিবারের শিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ে সে। প্রথম থেকেই তাকে খুব স্নেহ করতেন ডাক্তার ওয়ার্নিক। কথা প্রসঙ্গে তিনিই একদিন আমাকে অনুরোধ করলেন, 'লক্ষ করেছি, বাগানে হাঁটাহাঁটি করতে ভাল লাগে তোমার। তুমি বোধহয় খেয়াল করোনি যে জেনেভিবও বাগানে হাঁটতে যায়। তুমি যদি ওর সঙ্গে কথা বলো, ওর খুব উপকার হয়।'

আমি শুধু বিস্মিত হইনি, অস্বস্তিও বোধ করেছিলাম। 'কিন্তু আমি একটা মানসিক রোগিণীর সঙ্গে কি কথা বলব?'

'না-না, তোমাকে আমি কোন দায়িত্ব নিতে বলছি না,' তাড়াতাড়ি বললেন ডাক্তার ওয়ার্নিক। 'তোমাকে জেনেভিবের সঙ্গে আলাপ করতে বলছি শুধু একটি কারণে। তা হলো, স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গ উন্মাদ রোগীর জন্যে দারুণ উপকারী। অবশ্য কাজটা একেবারে সহজ নয়। একটু সাহস দরকার, একটু কৌশলীও হতে হয়।'

ভয়ে ভয়ে জানতে চাই, 'কি করতে হবে আমাকে?'

'রোগিণীর তালে তাল মেলাতে হবে। সে যা শুনতে চায় তাই তাকে শোনাতে হবে। তর্ক করলে ফল হবে উল্টো।'

নতুন কিছু করা হবে, এই ভেবে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলাম আমি। জেনেভিবের সঙ্গে পরিচিত হতে কোন অসুবিধে হয়নি আমার। তবে, আগেই বলেছি, একেক সময় নিজের একেকটা পরিচয় দেয় সে। কখনও বলে জেনি, কখনও ইসাবেল। এমন কি আমারও নতুন নামকরণ করেছে। তা-ও একটাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কখনও আমাকে রুডলফ বলে ডাকে, কখনও বলে রলফ্। মাঝে মধ্যে র‍্যাল্ফ-ও শুনি।

জেনেভিব যখন আমার ওপর নির্ভর করতে পারে, যখন আমাকে বিশ্বাস করতে বাধে না তার, শুধু তখনই আমাকে রুডল্ফ বলে সম্বোধন করে। বিশ্বাসের অভাব ঘটলেই রুডল্ফ হয়ে যায় রল্ফ। রল্ফ যে কি তাৎপর্য বহন করে, আজও আমি জানতে পারিনি। এই নামটা খুব কমই ব্যবহার করে ও।

দূর থেকে জেনেভিবকে দেখেই টের পেলাম, আজ নিজেকে ও ইসাবেলই ভাবছে, জেনি নয়। সে যাক, ও আসাতে সময়ও কাটবে, আনন্দও পাব। ও নিজেকে যেদিন ইসাবেল ভাবে সেদিন স্বপ্নলোকের বাসিন্দা হয়ে যায়, বাস্তব জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকে না। সেদিন ও যেন প্রজাপতির মত উড়তে থাকে বাতাসে।

'এই যে, সাহেব! এতদিন কোথায় ছিলেন?' হাল্কা মিষ্টি সুরে জানতে চাইল ইসাবেল।

মাত্র দেড় মাস হলো ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সব মিলিয়ে দেখা হয়েছে চার-পাঁচবার। দেখা হলেই জানতে চেয়েছে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' কথাগুলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক হলেও, বলার সুর সব সময় এক রকম থাকে না। মেজাজ যখন ভাল থাকে, গলায় মধু ঝরে। আর কোন কারণে মেজাজ যদি চড়া থাকে, সুরটা হয়ে ওঠে বিদ্রূপাত্মক।

আজ ওর গলাই বলে দিল, কথা বলছে ইসাবেল, জেনি নয়।

ওর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'ওই তো ওদিকে ছিলাম,' হাত তুলে বাগিচার বাইরেটা দেখিয়ে দিলাম।

ইসাবেলের চোখে রাজ্যের প্রশ্ন ও কৌতূহল। 'কেন, ওদিকে কি? কিছু খুঁজছিলেন বুঝি?'

'হয়তো তাই। কিন্তু কি খুঁজছিলাম জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না। কখন কি খুঁজে বেড়াই, সব সময় কি তা আর জানতে পারি?'

মাথা নাড়ল ইসাবেল। 'বৃথা খুঁজছেন, রল্‌ফ। যতই খুঁজুন, আপনি পাবেন না। কেউ কখনও পায় না।'

ওর কথায় কি যেন একটা রহস্য আছে। কিন্তু রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করা গেল না। ও আমাকে রল্‌ফ বলে ডাকায় আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। বললাম, 'আমি রল্‌ফ নই। আমার নাম লাডউইগ। লাডউইগ পছন্দ না হলে রডল্‌ফ বলে ডাকতে পারো। রল্‌ফ বলে ডেকো না।'

'রল্‌ফ বলব না আপনাকে, বলব না রুডল্‌ফও।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে ইসাবেল। 'কিন্তু, বন্ধু হে, নিজেকে আপনি যা ভাবছেন তা-ও আপনি নন। এ-সব থাক। চলুন, রল্‌ফ, ওদিক থেকে একটু বেড়িয়ে আসি...'

এই মেয়েকে কি বলা যায়? আগেও কথাটা ভেবেছি আমি, এখনও ভাবছি—মেয়েটির আসলে হয়তো কোন রোগই হয়নি, স্রেফ পাগল সেজে আছে। সত্যিকার পাগল কি কথায় কথায় এত রহস্য করে? মানুষকে এভাবে খোঁচা মারতে পারে?

যেন আমার মনের কথা ধরতে পেরেই ঠোঁট ফুলিয়ে ইসাবেল বলল, 'জানেন, ব্যাপারটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে।'

'কি আশ্চর্য লাগে?'

'এই যে, প্রতিটি মানুষ তার নিজের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে। একঘেয়ে লাগে না? একটু ইচ্ছে হয় না অন্য মানুষ সাজতে? বলতে পারেন, ব্যক্তিত্বর মধ্যে কি এমন আছে? ব্যক্তিত্ব জিনিসটাকে অত গুরুত্ব না দিলে কি হয়? আপনি আর ওই ডাক্তার, আপনারা কি যে ছাই বোঝেন...'

ওর এলোমেলো প্রলাপের মধ্যে কিছু বলবার সুযোগই পাচ্ছি না, কাজেই ওর থামার অপেক্ষায় না থেকে ছুঁড়ে দিলাম একটা মন্তব্য, অর্থাৎ খানিকটা প্রশ্নের সুরও থাকল। 'ডাক্তার ওয়ার্নিকও তাহলে ওরকম বোঝেন?'

'লোকটা ডাক্তার বলেই নিজের পরিচয় দেয় বটে।' এটুকু বলেই অকস্মাৎ বিজয় উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ইসাবেল, '...কিন্তু পরিণতি? বাতাস জিনিসটা কি সমস্ত কিছুর ওপর দিয়ে বইছে না? ডাক্তার তো গায়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল, আর তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আপনি—তো আপনারা দু'জন সেই বাতাসের কাছে মাথা না নোয়াবার জন্যে গোঁ ধরে আছেন কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর এই প্রশ্নের কি উত্তর দেব? বোকার মত তাকিয়ে আছি আর ওর এই সব অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনছি। অসংলগ্ন হলেও, ইসাবেলের গলাটা ভারি মিষ্টি। গাঢ় ছায়াঘেরা বাগিচায় চঞ্চল ঝর্ণা নত্য করছে যেন, কানে সুধাবর্ষণ করছে।

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছি আমরা। খানিকটা সামনে সাজানো গাছে গাছে ফুল ফুটে আছে, টিউলিপ আর নার্সিসাসের মেলা বসেছে যেন, রোদ লেগে ঝলমল করছে। ইসাবেল খিলখিল করে হেসে উঠল, তারপর সেদিকে ছুঁড়ে মারল হাতের হ্যাটটা।

বুড়ি এক নার্সকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ইসাবেলকে ডাকছেন, 'চলো, খেতে চলো।'

'কেন যাব?' আমাকে জিজ্ঞেস করল ইসাবেল। 'খাওয়াটা কি জরুরী? না খেলে কি হয়?'

'না খেলে মানুষ বাঁচে না,' বললাম আমি।

'বাজে কথা,' দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল ইসাবেল। 'বাঁচতে হলে যদি খেতেই হয়, পাথর কিছু খায় না কেন?'

'পাথর কি জ্যান্ত?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি।

'জ্যান্ত নয় বলছেন?' ইসাবেলকে বিস্মিত দেখাল, চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো আমাকে সে করুণা করছে। 'অন্য সব কিছুর চেয়ে অনেক বেশি জ্যান্ত ওরা, এতটাই জ্যান্ত যে কোনদিন মরে না।'

বুড়ি এসে ওর একটা হাত ধরল। 'চলো, খাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে।'

খালি হাতটা দিয়ে আমার একটা কনুই চেপে ধরল ইসাবেল। 'রুডলফ্, প্লীজ, আপনি আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না! আমার বড় ভয় করে!'

'না-না, সেকি! কেন তোমাকে আমি ছেড়ে যাব!' আমার চোখ দুটো ভিজে উঠল।

চার

কালো পোশাক দেখেই বুঝলাম, মহিলা শোক পালন করছেন। ধীর পায়ে আমাদের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন, মাথাটা যেন ভারে নুয়ে আছে। উঠানে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। অফিস থেকে বেরিয়ে তাঁর দিকে এগোলাম আমি। নিশ্চয়ই একটা স্মৃতিফলক কিনতে এসেছেন, কিংবা কবরের ওপর বসাবার মত সস্তাদামের একটা পাথর। 'আমাদের এখানে কি কি আছে তা আগে দেখে নিলে ভাল হয় না?' নরম সুরে তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ঝাঁকাবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো রাজি হলেন মহিলা। তারপর কে জানে কি ভেবে বললেন, 'তার কি কোন প্রয়োজন আছে?'

'এসেছেন যখন, দেখতে অসুবিধে কি? দেখলেই যে কিনতে হবে তা তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর নয়। যদি আপত্তি থাকে, আপনার সঙ্গে আমি থাকলাম না। একাই ঘুরে ঘুরে দেখুন।'

'না-না, সেটা কোন ব্যাপার নয়। আমার আসলে দরকার...'

চুপ করে থেকে তাঁকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি। এ আমাদের এমন একটা ব্যবসা, ধৈর্য ধরতেই হয়।

আরও কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মহিলা বললেন, 'আমার স্বামীর জন্যে আর কি।'

একবার মাথা ঝাঁকালাম। কথা না বলে অপেক্ষা করছি। তবে দাঁড়িয়ে থাকলাম না, নিঃশব্দে একটা বিশেষ জায়গায় চলে এসেছি। এখানে সারি সারি সাজানো রয়েছে নকশা করা সব বেলজিয়াম ফলক। মহিলা কিছু বলছেন না আর। অগত্যা আমাকেই মুখ খুলতে হয়। 'এগুলোই আজকাল খুব চলছে।'

'কিন্তু আমি ভাবছি,' কথা শেষ না করে অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। '...ভাবছি যদি আপত্তি করতেই থাকে, যদি অনুমতি না-ই দেয়...' অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে কথাগুলো বলতে পারলেন মহিলা, তা-ও শেষ করতে পারলেন না।

'সে কি! কি বলছেন আপনি! কিসের অনুমতি? সমাধিতে ফলক বসাবেন, তার আবার অনুমতি লাগে নাকি? কে আপত্তি করছে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি আমি।

'গির্জা থেকে ওঁরা বলছেন যে...'

'কি? গির্জা সমাধিতে ফলক বসাতে দিতে আপত্তি করেছে?' আমার বিশ্বাস হলো না।

মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ। পাদ্রী বললেন, অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়। মানে, গির্জার যে কবরস্থান, সেখানে আমার স্বামীর মাটি হবে না।' কথাগুলো বলার সময় অন্য দিক মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন।

'কেন? কেন গির্জার কবরস্থানে আপনার স্বামীকে কবর দেয়া যাবে না?'

'উনি...মানে, উনি ইয়ে করেছেন কিনা।'

'ইয়ে করেছেন মানে?'

'মানে...উনি আত্মহত্যা করেছেন।' মহিলা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। চোখ থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, সে যে কি অনুনয় ভরা কাতর দৃষ্টি! রীতিমত সন্ত্রস্ত লাগল তাঁকে আমার। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছেন। কথাগুলো বলে যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আত্মহত্যা করেছেন তো কি হয়েছে? শুধু এই কারণে ওরা বলছে গির্জার গোরস্থানে আপনার স্বামীকে মাটি দেয়া যাবে না?'

'হ্যাঁ, সে-কথাই বলছেন ওঁরা। বলছেন, ক্যাথলিক গোরস্থানে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাতে নাকি পবিত্র ভূমি অপবিত্র হয়ে যাবে।'

স্বভাবতই খুব রাগ হলো আমার। 'কথাটা যে-ই বলে থাকুক, সে একটা বোকা। যদি কেউ আত্মহত্যা করে থাকে, তার জন্যে তো আরও পবিত্র জায়গা খুঁজে বের করা উচিত, যদি থাকে। কারণ, অসহ্য কষ্ট না পেলে, হতাশা তাকে

www.BanglaBook.org

অস্বাভাবিক পীড়ন না করলে কোন মানুষ আত্মহত্যা করে না। দেখুন, আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই বুঝতে কোথাও ভুল হয়েছে আপনার। আপনি নিশ্চিত, পাদ্রী ঠিক এই কথা বলেছেন আপনাকে?'

'না, শুনতে বা বুঝতে আমার ভুল হয়নি। আমাকে মানা করে দেয়া হয়েছে।'

'পাদ্রীরা অবশ্য এরকম প্রলাপ বকেই থাকেন। নিজেদের কাজটাকে ওঁরা কথা বেচার ব্যবসা বলে মনে করেন যে! কিন্তু আপনি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেননি, গির্জার গোরস্থানে আপনার স্বামীর ঠাঁই না হলে, কোথায় তাঁকে মাটি দেয়া হবে?'

'গোরস্থানের আওতা বাদ দিয়ে যে-কোন জায়গায় হতে পারে,' বললেন মহিলা। 'গোরস্থান তো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ওটার বাইরে কোথাও। ওরা অবশ্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, আমি যেন পৌরসভার গোরস্থানে চেষ্টা করে দেখি।'

'করেছেন চেষ্টা?'

মাথা নাড়লেন মহিলা। 'না। ওখানে ওকে আমি কিভাবে শোয়াই বলুন তো? সবাই জানে, ওখানে দুনিয়ার যত আজেবাজে লোককে কবর দেয়া হয়।'

'তা হয়তো হয়, কিন্তু পৌরসভার ওই গোরস্থানটা ক্যাথলিক গোরস্থানের চেয়ে অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখতেও তো সুন্দর। আমার জানা মতে, অনেক ক্যাথলিক মরার আগে বলে যায়, "আমাকে পৌরসভার গোরস্থানে মাটি দিয়ো"।'

মাথা নেড়ে মহিলা বললেন, 'উনি, আমার স্বামী, অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন।'

'বেশ। ধার্মিক ছিলেন।'

'তো ধার্মিক একজন মানুষের আত্মা কষ্ট পাবে না, শেষ শোওয়াটা যদি পবিত্র মাটিতে না হয়?' কথা বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেললেন মহিলা। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন, 'তিনি তো দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি যে গির্জার গোরস্থানে তাঁর মাটি হবে না...'

'কোথায় মাটি হবে না হবে সে-সম্পর্কে তিনি সম্ভবত কিছুই ভাবেননি,' বললাম আমি। 'আসলে এটার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। সেজন্যেই মনে করি, পাদ্রীর কথায় আপনার দুঃখ পাওয়া উচিত নয়। আমি এমন অনেক গোঁড়া ক্যাথলিককে জানি, মারা যাবার পর যারা তথাকথিত পবিত্র ভূমিতে ঠাঁই পাননি। তাঁদের আত্মা কষ্টে আছে, এ-কথা বিশ্বাস করবার কোন কারণ দেখি না।'

'আপনি সত্যি বলছেন?' আগ্রহী হয়ে উঠলেন মহিলা। 'এমন ধার্মিক ক্যাথলিক আছেন, যাদের কবর গির্জার কবরস্থানে হয়নি? কোথায়, বলুন না, প্লীজ!'

'রাশিয়া আর ফ্রান্সের বিভিন্ন রণাঙ্গনে। এমনও হয়েছে যে একটা বড় গর্ত খুঁড়ে একশো বা দুশো লোককে কবর দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই তো ধার্মিক লোক। কে ক্যাথলিক, কে প্রোটেস্ট্যান্ট, কে ইহুদী, সেটা বড় কথা নয়। ওই কবরে সবারই ঠাঁই হয়েছে। কই, এই ব্যবস্থায় তাঁরা অসন্তুষ্ট, এমন তো কাউকে বলতে শুনি না!'

মহিলা কেমন যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। 'কিন্তু তাদের সঙ্গে কি আমার স্বামীর তুলনা চলে? তারা তো নিহত হয়েছেন যুদ্ধে। কিন্তু আমার স্বামী যে আত্ম...'

এবার আর নিঃশব্দে নয়, মহিলা গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের ব্যবসাটাই এমন যে চোখের পানি দেখতেই হবে। তবে এই মহিলার কান্নার সঙ্গে আর কারও কান্নার তুলনা চলে না। তার অশ্রু শুধু আপনজনকে হারানোর ব্যথা থেকে উৎসারিত নয়। তাছাড়া, মহিলা অত্যন্ত দুর্বল আর রোগাও বটেন, যেন একটু জোরে বাতাস বইলে পড়ে যাবেন।

'আপনি শান্ত হন, প্লীজ। কাঁদবেন না।'

মহিলা চোখ মুছলেন। ধরা গলায় বললেন, 'আমার বিশ্বাস, একেবারে শেষ মুহূর্তে নিশ্চয়ই উনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন...'

'তাহলে তো আর চিন্তার কিছু থাকলই না,' সঙ্গে সঙ্গে বললাম আমি। 'অনুতপ্ত হলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করতে দেরি করেন না।'

মহিলা চোখ বুজে ছিলেন, কথাটা শুনে এই প্রথম আমার দিকে তাকালেন। এক বিন্দু সান্ত্বনা পাবার আশায় যার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে আছে, ঈশ্বর ক্ষমা করবেন শুনে সে কি আগ্রহে দিশেহারা না হয়ে পারে? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'সত্যি? সত্যি ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করেছেন? আপনি ঠিক বলছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'অবশ্যই ঠিক বলছি। পাদ্রী বা অন্য কারও অবশ্য জানার সুযোগ নেই যে তিনি ক্ষমা পেয়ে গেছেন। জানবেন একা শুধু আপনার স্বামী। পাদ্রীরা তো আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন না।'

'ওঁরা বলছেন আমার স্বামী যে কাজ করেছেন তাতে নাকি মহাপাপ হয়েছে...'

'কিন্তু এ-কথা তো সবাই জানে যে পাদ্রীদের চেয়ে ঈশ্বর অনেক বেশি দয়ালু।'

এতক্ষণে বুঝতে পারছি, মহিলা স্বামীর মহাপাপ নিয়েই চিন্তিত। পবিত্র মাটিতে স্বামীর কবর হোক বা না হোক, সেটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাঁর ভয় লাগছে, আত্মহত্যার মত মহাপাপ করে ফেলায় ভদ্রলোককে না অনন্তকাল নরকবাস করতে হয়। এখন আমার কথা শুনে খানিকটা অভয় পাচ্ছেন তিনি—ঈশ্বর যদি দয়াই করে থাকেন, ক্ষমা করে থাকেন পাপ, তাহলে তো আর কঠিন বিচার আর নরকবাসের প্রশ্ন ওঠে না!

দুশ্চিন্তার ভার অনেকটাই হালকা হয়ে গেল। মহিলা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে আমাকে তাঁর দুঃখের গল্পটা শোনালেন। 'দায়ী হলো সেই টাকাটা, একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়ল। স্থায়ী আমানত হিসেবে সেভিং ব্যাঙ্কে ছিল।'

'আপনার স্বামীর নামে?' মহিলা দম নেয়ার জন্যে থামতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মাথা নাড়লেন তিনি। 'ইনি হচ্ছেন আমার দ্বিতীয় স্বামী। টাকাটা ব্যাংকে রেখে গিয়েছিলেন আমার প্রথম স্বামী। মারা যাবার কিছুদিন আগে আমাকে বললেন, "মেয়েটা রইল, আর তার বিয়ের জন্যে থাকল টাকাটা, যৌতুক দিয়ো।" কিন্তু হলো কি, শুনবেন? মেয়ের বিয়ে ঠিক হবার আগেই মার্কের দাম একেবারে পড়ে গেল। মানে একেবারে শূন্য হয়ে গেল আর কি। তো আমার দ্বিতীয় স্বামীই ছিলেন মেয়ের অভিভাবক, টাকার খবরাখবর তাঁরই রাখার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সময়মত ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। ধাক্কা খেলেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলতে গিয়ে। মার্কের দর জানতে পেরে মাথাটা তাঁর স্বভাবতই ঘুরে উঠল। "সব শেষ!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব শেষ!" করতে করতে ফিরে এলেন বাড়িতে। সত্যি তাই, সবই আমাদের শেষ হয়ে গেল।

'যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল সে বলল, যৌতুক না পেলে সে বিয়ে করবে না। মেয়ের রাগ গিয়ে পড়ল সৎবাবার ওপর। আর উনি, আমার স্বামী, নিজের ওপর রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। তাঁর ক্ষোভ, আরও আগে কেন মেয়ের বিয়ে দেননি। কিন্তু এটা তিনি ভেবে দেখলেন না যে আরও আগে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেও কোন লাভ হত না, ব্যাংক থেকে টাকা তোলা যেত না। স্থায়ী আমানত যে, পাঁচ বছর পুরো না হলে টাকা তোলার কোন ব্যবস্থা নেই। কাউকে কিছু না বলে, মনের দুঃখে, স্বামী আমার আত্মহত্যা করে বসলেন।'

'নিজের ওপর রাগ হবার বা দুঃখ করার কোন কারণ ছিল না,' বললাম তাকে। 'মার্কের যে এই বেহাল অবস্থা হতে যাচ্ছে তা আপনার স্বামী কেন, অর্থনীতির অনেক বড় বড় পণ্ডিতও আগে থেকে কিছু বুঝতে পারেননি। তাছাড়া, বুঝতে পারলেও কারও কিছু করার ছিল না। মার্কের বাজারদর যখন ভাল ছিল, সেভিং অ্যাকাউণ্ট থেকে তা তোলার ক্ষমতা আপনার স্বামীর ছিল না। এ হলো অনিবার্য বিপর্যয়, ঠেকাবার সাধ্য কারও নেই। তাছাড়া, এ অবস্থা একা তো আপনাদের নয়, জার্মানির ঘরে ঘরে সবাই ভুগছে।'

মহিলা আবার কেঁদে ফেললেন: 'তা ভুগছে, কিন্তু সেজন্যে তো আর ঘরে ঘরে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে না।'

'এ-ও আপনার ভুল ধারণা। ঘরে ঘরে না হলেও, আত্মহত্যার হার ইদানীং অনেক বেড়ে গেছে। গত মাসে আমরাই তো আত্মহত্যা করেছে এমন লোকের জন্যে সাতটা স্মৃতিফলক বেচেছি। আর সবাই কত বেচেছে কে জানে।'

খুব কম দামে সুন্দর একটা স্মৃতিফলক দিলাম মহিলাকে। খোদাই করারও দরকার হবে না, অর্থাৎ আরও কিছু পয়সা তাঁর বাঁচল। এতটা উদার শুধু যে সহানুভূতিবশত হলাম, তা নয়। অন্য একটা কাজের তাড়া আছে আমার। এমনিতেই ভদ্রমহিলাকে অনেক বেশি সময় দেয়া হয়ে গেছে, এরপর আর কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করার উপায় নেই। তাঁকে খুশি করে বিদায় করতে পেরেছি, এই তৃপ্তি নিয়ে জর্জকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম।

আমরা উসট্রিনজেন যাব। রেলপথে ত্রিশ মাইল দূর। ওখানে বেলা এগারোটার মধ্যে আমাদের পৌঁছাতে হবে। নাগরিকদের উদ্যোগে সেখানে মহাযুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে একটা স্মৃতিস্তম্ভ বসানো হচ্ছে। এই কাজটায় স্বয়ং মেয়র জড়িত। ক্রল কোম্পানি, অর্থাৎ আমরাই স্মৃতিস্তম্ভটা সরবরাহ করেছি। খোদাইকার আর রাজমিস্ত্রী ওখানে যারা কাজ করছে তারাও আমাদের লোক। গোটা ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, আমরা সব সুষ্ঠুভাবেই শেষ করে এনেছি। কাল বিকেলে একবার গিয়ে দেখেও এসেছি কাজটা কেমন হলো। আজ আমরা যাচ্ছি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে, সেই সঙ্গে বিলটাও নেব। আগেই পাকা কথা হয়ে আছে, অনুষ্ঠান শেষ হলেই আমাদের পাওনা পাই-পয়সা মিটিয়ে দেবেন মেয়র।

হ্যাঁ, সাজিয়েছে বটে। পতাকা আর কাগজের তৈরি মালায় ঝলমল করছে

www.BanglaBook.org

পরিবেশটা। কোম্পানির তরফ থেকে সবাই আমরা এসেছি–জর্জ, হেনরিক, খোদাইকার কার্ট ব্যাশ আর আমি।

মর্মর পাথরের ভিতের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্তম্ভটা। ওটার গায়ে খোদাই করা হয়েছে শহীদ সৈনিকদের নাম। তারা সবাই মাতৃভূমির ডাকে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল এই উসট্রিনজেন থেকে। গেল তারা, কিন্তু তারপর আর ফিরে এল না। সব মিলিয়ে আঠারোজন ছিল। দশজন ক্যাথলিক, ছ'জন প্রোটেস্ট্যান্ট, দু'জন ইহুদি।

শহরে দু'জন পাদ্রী–একজন ক্যাথলিক আর একজন প্রোটেস্ট্যান্ট। আজকের অনুষ্ঠানে দু'জনেই তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন যার যার গির্জা থেকে পবিত্র পানি, স্তম্ভটিতে ছিটিয়ে অভিষিক্ত করবেন। কিন্তু না, ইহুদি সমাজের পক্ষ থেকে কোন রাব্বি আসেননি। আসেননি মানে আসতে দেয়া হয়নি। নাগরিকসভা আসতে নিষেধ করে দিয়েছে।

বলাই বাহুল্য, এর মূলে কাজ করছে সেই প্রাচীন ধারা–প্রবল ইহুদি বিদ্বেষ। জার্মান সমাজে এ এক কুৎসিত কলঙ্ক। ইহুদিদের ওপর এই যে অবিচার, এটা কিন্তু অভিষেক উৎসবকে কেন্দ্র করে আজই এখানে প্রথম শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে সেই নাম খোদাই করার সময় থেকে। খ্রিস্টানদের তরফ থেকে আপত্তি জানিয়ে বলা হয়, যে দু'জন ইহুদি যুদ্ধে শহীদ হয়েছে তাদের নাম স্তম্ভে খোদাই করতে দেয়া হবে না। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন মেজর উলকেনস্টাইন। এই মেজর লোকটাকে যুদ্ধের পরপরই সেনাবাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কি, মিলিটারি মেজাজ দেখাবার কোন সুযোগই তিনি ছাড়েন না। ভাব দেখে মনে হয়, তাঁর যুদ্ধ এখনও থামেনি। গরম গরম কথা বলেন, দম্ভ আর অহমিকায় ফেটে পড়তে চান। তাঁর এই বাড়াবাড়ি করার স্বভাব কাইজারের আমলে যে-কোন সেনা-অফিসারের মজ্জাগত ছিল। ইনি সেই আমলের অনুকরণে বিরাট গোঁফও নিজের ঠোঁটের ওপর সযত্নে ধরে রেখেছেন। গোঁয়ার্তুমি, বদমেজাজ আর অসহিষ্ণুতা বিসর্জন দেননি।

মেজর উলকেনস্টাইন অবসর নেয়ার পরও কর্তৃত্ব ফলাবার ঝোঁকটা দমন করতে পারেননি। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হবার পর কর্তৃত্ব তিনি কার ওপর ফলাবেন? অনেক ভেবেচিন্তে তাই নিজে উদ্যোগী হয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই বাহিনীর নাম 'প্রবীণ সৈনিক সংঘ'। সংঘের সর্বাধিনায়ক তিনিই। বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ইদানীং নিস্তেজ হয়ে পড়া সেই জঙ্গী মনোভাবটা গোটা দেশে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে; যে মনোভাব, তাঁর ভাষায়, জার্মান জনগণকে গত চার যুগ ধরে উজ্জীবিত করে আসছে। সংঘের এই প্রচারণায় বেশ ভালই কাজ হচ্ছে। ফলাফল? মহাযুদ্ধে মহাপরাজয়ের পর যে কাইজার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিশাপ কুড়াচ্ছিলেন, সেই তিনিই আজ আবার কিছু কিছু লোকের কাছে বীরপূজা পেয়ে ধন্য হচ্ছেন। তবে ব্যাপারটা ঘটছে চুপিসাড়ে, গোপনে।

এ প্রসঙ্গ পরে আসবে। এই মুহূর্তে বিবেচনার বিষয় স্মৃতিস্তম্ভে নাম খোদাই নিয়ে মেজর উলকেনস্টাইনের গোঁয়ার্তুমি। ইহুদি বিদ্বেষ তাঁর শিরায় শিরায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রবাহিত। ওরা চিরকালই তাঁর দু'চোখের বিষ। স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের নাম খোদাই করা প্রসঙ্গটি যখন তোলা হলো, তিনি ফতোয়া জারি করে বললেন, স্তম্ভে নাম থাকবে আঠারো নয়, ষোলোটা। কেন?

প্রশ্নটা করল সাংগঠনিক কমিটি। কমিটির সভাপতি মেজর নিজেই। স্বভাবতই প্রশ্ন শুনে খেপে গেলেন তিনি। 'কি বলতে চাও তোমরা?' কর্কশ গলায় কমিটির সদস্যদের পাল্টা প্রশ্ন করলেন। 'দু'জন ইহুদির নামও তোমরা রাখতে চাও নাকি?'

'না, মানে, ওরাও তো যুদ্ধে গিয়েছিল...লড়াই করতে করতেই মারা গেছে...'

'কে বলল যুদ্ধ করতে করতে মারা গেছে? সাক্ষী আছে, দেখেছে কেউ? তোমরা কি মনে করো, খাতায় যারা নাম লেখায় তারা সবাই যুদ্ধ করতে যায়? ভুল, মারাত্মক ভুল!'

'কি ভুল? কোথায় ভুল?'

'যুদ্ধে যাবার জন্যে যারা নাম লেখায় তাদের মধ্যে শতকরা বিশজন স্পাই। সামরিক তথ্য পাচার করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর কে না জানে ইহুদি মাত্রই স্পাই—কেউ রাশিয়ার হয়ে কাজ করে, কেউ আমেরিকানদের হয়ে, আবার কেউ ইংল্যাণ্ডের হয়ে। লেভির কথা বলছ? ওরা দুই ভাই যে পঞ্চমবাহিনীর সদস্য ছিল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে তার অকাট্য প্রমাণ সংরক্ষিত আছে। তোমরা বললেই তাদের নাম স্মৃতিস্তম্ভে রাখব আমি? অসম্ভব, কক্ষনো না!' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছিলেন মেজর। 'জার্মান জাতি যদি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে থাকে তো তার জন্যে দায়ী ওই ইহুদিরা।'

'কিন্তু এ-সব তো ভিত্তিহীন অভিযোগ, তাই না? ঢালাও ভাবে ইহুদিদেরকে এভাবে দায়ী করা কি ঠিক হচ্ছে?'

'কি বললে? ভিত্তিহীন? কথাটা কে বললে? আরেকবার বলো তো! আরে, কাদেরকে কমিটির সদস্য বানানো হয়েছে! তুমি নিজেই তো দেখছি বেঈমান, দেশদ্রোহী! বিশ্বাসঘাতক আর ইহুদি, শব্দ দুটো সমার্থক, বুঝলে! আমার এই কথা যে বিশ্বাস করে না, আমি তাকেই দেশদ্রোহী বলি!'

উলকেনস্টাইন যখন কথা বলেন, তখন তাঁর মুখ হয়ে যায় অনলবর্ষী কামান। এই কামানের গর্জন যখন শুরু হয়, কেউ আর সাহস করে ইহুদিদের সমর্থনে একটা কথাও বলতে পারে না। তিনি খেপে ওঠায় পরিস্থিতি নাজুক হয়ে ওঠে। লেভিরা দুই ভাই যে স্মৃতিস্তম্ভ থেকে বাদ পড়ছে, এটা প্রায় সবাই ধরেই নিয়েছিল। তবে তারা ন্যায় বিচার পেল মেয়রের চেষ্টায়। তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেন।

কেন মেয়র নাক গলালেন? তারমানে কি তিনি নিরপেক্ষ ভাল মানুষ? বৈষম্য পছন্দ করেন না? ঈশ্বর, রক্ষে করো!

তাহলে আসল কথাটা ফাঁস করতে হয়।

মেয়রের এক ছেলে ছিল, সে-ও যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছিল। ওই নাম লেখানো পর্যন্তই, যুদ্ধে আর তার যাওয়া হয়নি। যাবে কি করে, তার আগেই তো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হলো ওয়ার্ডেনব্রাক সামরিক হাসপাতালে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওখানেই ছেলেটা মারা যায়। যুদ্ধে নয়, মারা গেছে অসুখে, কিন্তু তারপরও মেয়রের খুব ইচ্ছে যে স্মৃতিস্তম্ভে তাঁর ছেলের নামটাও খোদাই করা হোক। অর্থাৎ তিনি চান তাঁর ছেলে শহীদ হিসেবে মরণোত্তর সম্মান পাক। নিজের দাবি জোরাল করবার জন্যেই সবাইকে বলতে শুরু করলেন, 'উসট্রিনজেন থেকে যারা যুদ্ধে গিয়েছিল এবং যেতে চেয়েছিল, তাদের সবার নামই থাকা উচিত স্মৃতিস্তম্ভে। লেভিদের নাম থাকবে, থাকবে আমার ছেলের নামও।'

কিন্তু যতই প্রচারণা চালান, শহরবাসী কিন্তু মেয়রের দাবি গ্রাহ্য করল না। তারা প্রমাণ করে দিল এটুকু বোঝার বুদ্ধি তাদের আছে যে যুদ্ধে যারা যেতে চেয়েছিল, কিন্তু যেতে পারেনি, তাদের নাম স্মৃতিস্তম্ভে খোদাই করা হলে তা দেখে দুনিয়ার মানুষ হেসে গড়াগড়ি খাবে। তবে মেয়রের দাবির প্রথম অংশটা তারা বাতিল করল না। সবাই একবাক্যে জানাল, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু সেখান থেকে আর ঘরে ফিরে আসেনি, জাতিধর্মনির্বিশেষে তাদের সবারই নাম স্তম্ভে থাকবে।

শহরের লোকজন একজোট হয়ে কোন রায় দিলে সেটা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা বা সাহস এখন পর্যন্ত কারও নেই। তাই দুই ইহুদি যুবকের নাম শেষ পর্যন্ত খোদাই করা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভে। সব মিলিয়ে আঠারোটা নামই উঠেছে। শুধু যে মৌখিক রায় তা তো নয়, রীতিমত ভোটাভুটি হয়েছে। সেই ভোটে মহাপরাক্রমশালী উলকেনস্টাইন হেরে গেছেন। পাঁচ বছর আগে মহাযুদ্ধে হেরেও এত ব্যথা পাননি তিনি। স্বভাবতই তাঁর মেজাজ আগুন হয়ে আছে। দাঁত কিড়মিড় করছেন প্রবল আক্রোশে। শহরের লোকগুলো আসলে একেকটা গবেট! কি জানে ওরা? কি বোঝে? কতবড় দুঃসাহস, উলকেনস্টাইনের বিরুদ্ধে ভোট দেয় তারা! তাঁর মতামতকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের মত কায়েম করে!

উলকেনস্টাইন খেয়াল রাখলেন, কিভাবে কি ঘটল।

তার নাম বেস্ট। পেশায় কাঠমিস্ত্রী। সেই নাটের গুরু। তার নেতৃত্বেই শহরবাসী একজোট হয়ে উলকেনস্টাইনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। হায় হায়, দিনে দিনে এ কি হাল হলো সমাজের! কাইজারের ঘনিষ্ঠ একজন সেনাপতি, চওড়া গোঁফ দেখলে মাঝে মধ্যে যাকে কাইজার বলে সন্দেহ হয়, তাঁর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে কিনা একজন সামান্য কাঠমিস্ত্রী? ঠিক হ্যায়, এর বিহিত ব্যবস্থা করা হবে। সময় হোক। এক মাঘে কি শীত পালায়?

অনুষ্ঠান শুরু হলো। পবিত্র পানি ছিটানো, মাল্যদান ইত্যাদি শেষ হলো। এখন শুধু বাকি স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন। উন্মোচন করবেন কে? কে আবার, স্বয়ং উলকেনস্টাইন।

মেজর উলকেনস্টাইন পুরোদস্তুর সামরিক উর্দি পরে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর এই ইউনিফর্ম সেই কাইজার আমলে তৈরি। এটা পরা নিষেধ। শুধু নিষেধ নয়, গুরুতর আইনবিরুদ্ধ কাজ। শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু আইন কি সবার বেলায় প্রযোজ্য হয়? হয় না। মেজর উলকেনস্টাইনকে ধরতে আসে এমন সাহস কার? তাঁর পিছনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সমর্থন রয়েছে না! কেউ তাঁর গায়ে হাত দিলে সংঘের সদস্যরা তাকে মেরে ভর্তা করে ফেলবে না!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উলকেনস্টাইন ভাষণ দিচ্ছেন। সে কি ভাষণ, শুনলে শান্ত নির্বিরোধী লোকের রক্তও টগবগ করে ফুটতে শুরু করবে। বক্তৃতা তো নয়, উলকেনস্টাইন যেন আগুন উদ্গিরণ করছেন। দীর্ঘ বক্তৃতা, রাত জেগে মুখস্থ করে আসতে হয়েছে। শব্দগুলো তাঁর মুখ থেকে কামানের গোলার মতই সগর্জনে বেরিয়ে আসছে। তাঁর বক্তব্য একটাই। কেউ যদি বলে মহাযুদ্ধে জার্মানি হেরে গেছে, সে একটা মিথ্যেবাদী! শুধু মহাযুদ্ধে নয়, কোন যুদ্ধেই কখনও হারেনি জার্মানরা। হারেনি, হারবেও না। জার্মানরা হলো বীর যোদ্ধা, তাদের অভিধানে পরাজয় বলে কোন শব্দ নেই। যুদ্ধে তাহলে কি ঘটেছিল? প্রকৃত সত্য তিনি, মেজর উলকেনস্টাইন বলছেন। আসলে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি আর সচিব ষড়যন্ত্র করে ছিল, তারাই একটা নীলনক্সা অনুসারে অপরাজেয় জার্মানকে দিয়ে একটা মর্মান্তিক দাসখতে সই করিয়ে নিয়েছে, যে দাসখতের নাম হলো ভার্সাই চুক্তি। জার্মানির নেহাতই দুর্ভাগ্য যে সেই বিশ্বাসঘাতকরাই আজ জার্মান রাষ্ট্রের হর্তাকর্তাবিধাতা। তাদেরকে সমূলে উৎখাত করতে না পারলে জার্মান জাতির অস্তিত্ব বলে পৃথিবীর বুকে কিছু থাকবে না। বর্তমান জার্মানিতে সবচেয়ে বড় কাজই এখন তাদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। এ-কাজে দেশ-প্রেমিক প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে। এই সংকটে গাফলতি করা হবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। দেশপ্রেমিক ভাইসব, আসুন, যে যার পবিত্র দায়িত্ব মাথায় তুলে নিন।

দেশপ্রেম বলতে কি বোঝায় সে-সম্পর্কে নিজস্ব একটা ধারণা আছে উলকেনস্টাইনের, বক্তৃতায় তাঁরও ব্যাখ্যা থাকল। প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীরা তখনই শুধু দেশপ্রেমিক বলে গণ্য হতে পারবে যখন তারা পরিত্যক্ত ইউনিফর্ম আবার গায়ে চড়িয়ে পরবর্তী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নেবে এবং প্রতিপক্ষকে আহ্বান জানাবে শক্তি-পরীক্ষার জন্যে। আর উসট্রিনজেন সহ অন্যান্য শহরের লোকজন তখনই শুধু দেশপ্রেমিক বলে গণ্য হতে পারবে যখন তারা ওই সব সামরিক ইউনিফর্ম পরা অফিসারদের প্রতিটি আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করবে। একে কেউ যদি বিপ্লব বলে, আপত্তি নেই; কারণ এই বিপ্লবেরই তো প্রয়োজন এখন। একে কেউ যদি বিদ্রোহ বলে, তাতেও আপত্তি নেই: কারণ মার্কের দৈনিক পতন ঠেকাবার জন্যে সে বিদ্রোহই তো এখন করতে হবে। যার শরীরে নির্ভেজাল জার্মান রক্ত বইছে সে কি বিদ্রোহের পতাকা ওড়াতে ভয় পাবে? কক্ষনো না! সবাই জানে, জার্মানির অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে বিদ্রোহ করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।

আমার পরিচিত যারা বক্তৃতা শুনছে তাদের কার কি অবস্থা? সামরিক ক্রল হাঁ করে গিলছে, চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। উলকেনস্টাইনকে পুরোপুরি সমর্থন করে সে, জার্মানির শক্তি-সামর্থ্যের ওপর তার অবিচল আস্থা।

কার্ট ব্যাশ, ভাস্কর, স্মৃতিস্তম্ভের খোদাইকার। স্তম্ভের মাথায় বল্লমে গাঁথা সিংহমূর্তি বসিয়ে শহরে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে নিজের তৈরি ওই সিংহেরই দিকে। অথচ চোখ এখনও কাপড় দিয়ে ঢাকা। উলকেনস্টাইনের বক্তৃতা তার মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে বলা কঠিন।

জর্জ ক্রল-এর দৃষ্টি স্থির নয়, চঞ্চল। আমার মনে হলো, এই মুহূর্তে ওর

www.BanglaBook.org

সবচেয়ে বেশি দরকার একটা চুরুট। ব্রাজিল থেকে আমদানি করা চুরুট না হোক, একটা হলেই হয়। ওর চঞ্চল দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে, উলকেনস্টাইনের বক্তব্য ওর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

নিজের কথা আর কি বলব! এমন একটা কোট গায়ে চড়িয়েছি যেটা আমার নয়, একটা দোকান থেকে ধার করা। সাইজে ছোট হওয়ায় বুকে চেপে বসেছে কোটটা, ভয় হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে দম আটকে যাবে। উলকেনস্টাইনের বক্তৃতা শুনে আমার মাথা ঘুরছে।

এক সময় থামল সে। দর্শকদের মধ্যে থেকে জয়ধ্বনি উঠল—জার্মানির জয় হোক! উলকেনস্টাইন জিন্দাবাদ!

ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট পাদ্রীরা যার যার ধর্মীয় অনুষ্ঠান আগেই সেরে ফেলেছেন। ফুলের মালাগুলো জায়গামত রাখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটা মালা আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে। উলকেনস্টাইন থামতেই স্তম্ভের গা থেকে কাপড়ের আবরণ খুলে ফেলা হলো। দুপুরের কড়া রোদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বল্লম গাঁথা সিংহমূর্তি। সেই মুহূর্তে দরাজ গলায় কাইজারী আমলের রণসঙ্গীত গেয়ে উঠলেন উলকেনস্টাইন, 'পিতৃভূমি! মাতৃভূমি! স্বর্গভূমি! সবার ওপরে তুমি!'

এ গান এখন নিষিদ্ধ। কিন্তু উলকেনস্টাইন আইনকে ভয় পান না, নিষেধাজ্ঞাকে গ্রাহ্য করেন না। নিষেধাজ্ঞায় বলা হয়েছে, এই গান কাউকে গাইতে দেখা গেলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে। তাসত্ত্বেও গাইছেন তিনি। সাহস করে অনেকেই তাঁর সঙ্গে সুর মেলাচ্ছে। কেউ কেউ উলকেনস্টাইনকে খুশি করার জন্যে গাইছে। বেশ কিছু লোককে দেখা গেল গানটা গাইছে না, উলকেনস্টাইনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বাজনদাররা কেউ ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে বাজাতে শুরু করেছে, আবার কেউ ছুটে পালাচ্ছে।

গান চলছে, মেয়র আসন ত্যাগ করলেন। দেখাদেখি আমরাও উঠে পড়লাম। সবাই এতক্ষণ বসে ছিলাম তা ওই মেয়রের কারণেই। সবারই ইচ্ছা, তাঁকে অনুকরণ করা। আমাদের ব্যাপারটা আরও একটু অন্য রকম। আমরা মেয়রকে শুধু অনুকরণ করব না, অনুসরণও করব। কারণ স্তম্ভের দাম তো তাঁর কাছ থেকেই পাবার কথা হয়ে আছে।

আমরা তিনজন মেয়রের পিছু নিলাম। একটু পিছিয়ে পড়ল হেনরিক, উলকেনস্টাইনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এখনও গানটা গাইছে সে। পিতৃভূমি! মাতৃভূমি! স্বর্গভূমি! সবার ওপরে তুমি!

BanglaBook.org

পাঁচ

মেয়রের গতি খুব বেশি, তাঁর সঙ্গে আমরা পারলাম না। তিনি গাড়িতে চড়ে হুস

www.BanglaBook.org

করে চলে গেলেন। তবু আমরা তাঁর পিছু ছাড়লাম না, হেঁটেই অনুসরণ করলাম।

মেয়র হাউসে পৌঁছে লোক মারফত খবর পাঠালাম। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক এল। একটা ঘরে ঢুকে দেখি খাবার সাজানো একটা টেবিলে বসে আছেন তিনি। খাবার মানে হালকা নাস্তা–কফি, কেক ইত্যাদি। আমাদের কথা শুনে চোখ কপালে তুললেন তিনি।

'কি বলছেন? আজ দাম দিতে হবে? আশ্চর্য তো!'

জানতাম এরকম একটা কিছু শুনতে হবে। ভাগ্য ভাল যে হেনরিক ক্রল আমাদের সঙ্গে আসেনি, উলকেনস্টাইনের গান শোনার জন্যে মাঝপথ থেকে ফিরে গেছে স্মৃতিস্তম্ভের কাছে। মেয়র হাউসের ওয়েটিং রূমে আমাদের সঙ্গে কার্ট ব্যাশ ছিল, কিন্তু এখন দেখছি সে-ও গায়েব হয়ে গেছে। খুব একটা দোষ দেয়া যায় কি, কেউ যদি বদ্ধ ঘরের ভেতর চুরুটের ধোঁয়া শোঁকার বদলে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকতে চায়?

মেয়র একা নন, ঘরে তাঁর একজন কেরানী আছে। লোকটা কুঁজো। নাম ওয়েস্টহোজ। দু'জনই আমাদের প্রতিপক্ষ। ওদের সঙ্গে লড়ব আমি আর জর্জ।

ভদ্রতা দেখাতে কার্পণ্য করলেন না মেয়র। আমাদের হাতে একটা করে চুরুট গুঁজে দিলেন। কেক ও কফি খাওয়া শেষ, আয়েশ করে হেলান দিলেন চেয়ারে, তারপর নরম সুরে অনুরোধ করলেন, 'আগামী হপ্তায় আসুন একবার, দেখব তখন কি করা যায়। হিসাব-টিসাব দেখে যদি বুঝি সব ঠিকঠাক আছে, সঙ্গে সঙ্গে দাম চুকিয়ে দেব। নিজেরাই তো দেখলেন, কি একটা ঝামেলা গেল। আপনাদের হিসাব নিয়ে বসার ইচ্ছা ঠিকই ছিল, কিন্তু সময় পেলাম কোথায়।'

মেয়র চুরুট দিচ্ছেন, আমরা কি তা না নিয়ে পারি? সেই চুরুট নাড়াচাড়া করছে জর্জ, বলল, 'ঝামেলার কাজে ঝামেলা তো হবেই। কিন্তু হের মেয়র, দামটা যে আজই আমাদের পেতে হয়! খুবই প্রয়োজন, তা না হলে...'

'টাকার আবার কার প্রয়োজন নেই?' বলে খিক খিক করে হাসতে লাগল কুঁজো কেরানী।

তার উদ্দেশ্যে একটা চোখ টিপলেন মেয়র। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে গ্লাসে মদ ঢালতে শুরু করল কেরানী।

মেয়র বললেন, 'আরে সাহেব, আগে একটু গলা ভেজান। কথা বলার সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।'

স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচনের এই অনুষ্ঠানে আমরা কিন্তু মেয়রের আমন্ত্রণে যোগ দিইনি। দাওয়াত দিয়েছিলেন উলকেনস্টাইন। কিন্তু মুশকিল হলো, তাঁর আবার অভ্যাসই নেই টাকা-পয়সার মত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর। দাওয়াত দেয়ার ভার একা শুধু যদি মেয়রের ওপর থাকত, আমাদের নাম নির্ঘাত বাদ পড়ে যেত। খুব বেশি হলে একটা আমন্ত্রণ-লিপি পাঠানো হত, তা-ও হেনরিকের নামে। কারণ হেনরিককে নিজের ইচ্ছা মত যেদিক খুশি ঘোরাতে ফেরাতে পারতেন মেয়র।

মুখে চুরুট তুলে আবার সেটা হাতে নিল জর্জ। 'কি কথা হয়েছিল তা ভুলে

www.BanglaBook.org

গেলে তো চলে না।'

মেয়র জানতে চাইলেন, 'কি যেন কথা হয়েছিল?'

'কেন, আপনার মনে নেই? কথা ছিল অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র দামটা পেয়ে যাব আমরা।'

ঘাড়টা অকারণেই একবার দোলালেন মেয়র। 'আরে সাহেব, কথার তো কোন নড়চড় হচ্ছে না। আমি তো আপনাদেরকে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করতে বলছি না। বলছি আগামী হপ্তায় আসুন। কাজ ফুরালেই সব জায়গায় যদি দাম পেয়ে যেতেন, তাহলে তো আর...'

'কাজ শেষ হওয়ামাত্র দাম পাব, এই শর্তেই মাল দিই আমরা, তা না হলে দিই না।'

'কিন্তু এবার তো দিয়েই ফেলেছেন।'

গ্লাসে স্ন্যাপস অর্থাৎ মদ ভরে এগিয়ে দিচ্ছে কেরানী। নিষেধ করি না, হাত বাড়িয়ে নিচ্ছি। সকৌতুকে তার উদ্দেশে আবার চোখ টিপলেন মেয়র।

পরিবেশটা হালকা রাখার জন্যে আমি বললাম, 'স্ন্যাপসটা দারুণ তো!'

'তাহলে আরও এক গ্লাস দিই?' জানতে চাইল কেরানী।

'তা দিতে যখন চাইছেন, দিন।'

কেরানী ঢালছে, আমরা গিলছি। এভাবে বেশ কিছুটা সময় পার হলো।

মেয়র অবশেষে আবার প্রসঙ্গটা তুললেন। 'তাহলে আগামী হপ্তায় আপনারা আসছেন।'

'আমরা এই তো এসে গেছি,' বলল জর্জ। 'এখন শুধু দামটা নেয়া বাকি।'

মেয়র রাগে ফুলছেন। মদ খাচ্ছি, চুরুট ফুঁকছি, তারপর আবার আজ পাব না জেনেও দাম মেটাতে তাগাদা দিচ্ছি। এ তো স্রেফ নেমকহারামি, তাই না? মেয়রের সঙ্গে এরকম কেউ করে?

নিস্তব্ধতা কাঁটার মত বিঁধছে গায়ে। খুক করে কাশলাম আমি।

'উঁহুঁ, না,' বললেন মেয়র, গলাটা কর্কশ। 'আগেই তো বললাম, আগামী হপ্তায়।' একটু থেমে গলা একটু নরম করলেন, 'তবে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, গলা শুকিয়ে যেতে পারে, তাই যদি আরও এক গ্লাস স্ন্যাপস্ খেতে চান...'

'তা দিতে যখন চাইছেন, দিন,' বলল জর্জ।

মেয়র সাধলেন, আমরা গিললাম। পরিস্থিতি বদলে গেল। অন্তত বদলে যাবার কথা। মেয়র ও কেরানী দু'জনের মেজাজই খোশ। মেয়র ভাবছেন, কেল্লা ফতে। কেরানী ভাবছে, আমাদেরই জিত হলো।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম আমি। শেষ বিকেলের প্রকৃতি, যেন কোন জাদুকর শিল্পীর অমূল্য চিত্রকর্ম। উঠানের শেষ মাথায় একটা খিলান ও গেট, একটা নিঃসঙ্গ ওক গাছ, তারপর যতদূর দৃষ্টি যায় উদার মাঠ, মাঠের পর মাঠ—কোথাও তা হালকা সবুজ, কোথাও উজ্জ্বল বাদামী। মনটা কেমন ছোট হয়ে এল। জীবন তো ওখানেই, ওই খোলা আকাশের নিচে। ঋতু-বৈচিত্র্যে সবুজাভ-সোনালি যেখানে থমকে আছে। অথচ পাশেই, ধোঁয়া ভরা বদ্ধ কামরার ভেতর, টাকা-পয়সা আদায় নিয়ে মানুষের কি নোংরামি! দূর, ধ্যাত, ছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাকে ধিক্কার দিচ্ছি জানি না। আমি অন্যমনস্ক, তারপরও জর্জের কথা কানে আসছে।

জর্জ বলছে, 'সত্যি, লজ্জা করে, হের মেয়র। লজ্জা হবে না-ই বা কেন, তাগাদার চেয়ে ছোট কাজ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এ-ও সত্যি যে যা দিনকাল পড়েছে, পাওনা ফেলে রাখার একবারেই কোন উপায় নেই।'

'ফেলে রাখতে বলা হয়নি,' বললেন মেয়র। 'বলা হয়েছে এক হপ্তা পর আসতে।'

'এক হপ্তা পরে আসতে বলছেন, তার মানেটা কি দাঁড়ায় সেটা একবার ভাবুন,' শান্ত সুরে কথা বলছে জর্জ। 'মার্কের দাম আজকে যা, এক হপ্তা পর সেই দাম থাকবে না, অনেক কমে যাবে। যতটাই কমুক, ততটাই আমাদের লোকসান। এমনিতেও এই কাজে লাভ হয়নি আমাদের। যা ধরা হয়েছিল তারচেয়ে তিন হপ্তার পরিশ্রম বেশি লেগেছে কাজটায়।'

মেয়র হাসলেন না, রাগলেন না। চোখ দুটো সরু করলেন শুধু। সেই চোখে ধূর্তামি ভরা দৃষ্টি। 'লোকসান যখন হলোই, আরও নাহয় একটু হোক।'

'কিন্তু আমাদেরও তো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে, হের মেয়র।'

'এ আর কে না জানে যে সমাজে ব্যবসায়ীরাই ভাল খায় আর ভাল পরে।' এবার হেসে উঠলেন মেয়র। 'আর তাছাড়া, ব্যবসা করতে গেলে তো লাভ যেমন হবে, মাঝে মধ্যে তেমনি লোকসানও দিতে হবে। এটাই তো নিয়ম।'

কুঁজো লোকটা হঠাৎ ছাগলের মত ব্যাঁ ব্যাঁ করে উঠল। 'দাম যদি না দেয়া হয়, আপনাদের এখন আর কিছু করারও নেই, তাই না? বসানো যখন একবার হয়ে গেছে, স্তম্ভটা তো আর তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়!'

'কেন তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়?' থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'এখানে আমরা তিনজন এসেছি, তার মধ্যে একজন আবার মিস্ত্রী। মাথা থেকে ঈগলটাকে পাড়া পানির মত সহজ কাজ। দরকার হলে সিংহটাকেও খুলে নেয়া যায়। যদি খবর দিই, দু'ঘণ্টার মধ্যে চলে আসবে আমাদের মিস্ত্রীরা।'

কুঁজো কেরানী হাসল। 'কি বলছেন নিজেও সম্ভবত জানেন না। ওটা কি শুধু একটা পাথর? জ্বী-না। ওটা হলো একটা স্মৃতিস্তম্ভ। রীতিমত ভাবগম্ভীর পরিবেশে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, শহীদদের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। অথচ ভাবছেন আপনারা ওটা খুলে নিয়ে যাবেন? উসট্রিনজেনের লোক সংখ্যা কত? তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে ভেবেছেন? বাধা দেবে না?'

'শুধু কি তাই?' মেয়রের সুরটা যেন কাটা ঘায়ে লবণের ছিটে দিচ্ছে। 'মেজর উলকেনস্টাইনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? তিনি আর তাঁর প্রাচীন সামরিক সংঘ স্মৃতিস্তম্ভটাকে পাহারা দিচ্ছে না? ওই সংঘের সদস্যরা যে গোঁড়া দেশপ্রেমিক, আশা করি সে-কথা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার দরকার নেই।'

'কথা আরও আছে। ভেবে দেখুন, স্মৃতিস্তম্ভ খুলে বা তুলে নিয়ে যাবার মত জঘন্য একটা কাজ যদি আপনারা করেই বসেন, তার পরিণতি কি ভাল হবে? এই শহরে আর কেউ আপনাদের স্মৃতিস্তম্ভ কিনবে? এমন কি একটা ফলকও কি আপনারা বেচতে পারবেন?' কথা শেষ করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল

www.BanglaBook.org

কুঁজো কেরানী।

'তারচেয়ে আরও এক গ্লাস করে স্ন্যাপস খান, তারপর বাড়ি ফিরে যান।' মেয়রও হাসছেন, তবে নিঃশব্দে।

নাহ্, কঠিন ফাঁদেই পড়া গেছে! খুব মজা পাচ্ছে ব্যাটারা। ভেবে কোন কূল পাচ্ছি না।

হঠাৎ দূরে কোথাও একটা জোরালো হৈ-চৈ শোনা গেল। একজন লোক চিৎকার করে ডাকছে, 'মেয়র! মেয়র!' ছুটে কাছে চলে আসছে লোকটা। খিলান পেরিয়ে মেয়র হাউসে ঢুকে পড়ল। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেরি হবে, তাই সরাসরি জানালা লক্ষ্য করে ছুটছে। আমরা তাকে জানালার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখলাম। 'মেয়র! মেয়র!'

'অ্যাঁই। কি ব্যাপার? অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?' মেয়র ধমক দিলেন।

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছে লোকটা। 'আপনাকে এখুনি একবার আসতে হবে, হের মেয়র! খুব খারাপ খবর! মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

'অ্যাঁ! কী? মারাত্মক দুর্ঘটনা? মানে?'

'বেস্টকে তো চেনেনই। ছুতোর মিস্ত্রী! ওই বেস্টই!'

'বেস্ট কি?' মেয়র বিরক্ত। 'কি হয়েছে তার?'

'বেস্ট একটা পতাকা তুলেছিল।' লোকটা এত হাঁপাচ্ছে যে একদমে বেশি কথা বলতে পারছে না।

'তুলেছিল। তো কি হলো?'

'ওই পতাকা টেনে নামাতে গিয়েছিল ওরা। দুর্ঘটনাটা তখনই তো ঘটল।'

'ওরা কারা? ও, আচ্ছা, বুঝেছি! তা ওরা পতাকা নামাতে গেল, অমনি গুলি চালিয়ে দিল বেস্ট, এই তো? ওই ব্যাটা বদমাশ সমাজবাদীটা...'

'না-না, গুলি না! কেউ গুলি করেনি। কিন্তু হের মেয়র, ওর রক্ত যে বন্ধ করা যাচ্ছে না!'

'পরিষ্কার করে বলো, কার রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না?' মেয়র জিজ্ঞেস করলেন। 'বেস্ট ছাড়া অন্য কারও নয় তো?'

'হের মেয়র, আহত হয়েছে বেস্ট। রক্তও বেরুচ্ছে তার।'

মেয়রের চেহারা থেকে উদ্বেগ কেটে গেল, মুখটা ভরে উঠল প্রসন্ন হাসিতে। 'বেস্ট আহত হয়ে থাকলে এত চেঁচাচ্ছ কেন?'

'হের মেয়র, লোকটা উঠতে পারছে না। মুখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, গল গল করে...'

কুঁজো কেরানী এতক্ষণে সুচিন্তিত মতামত দিল, 'নাকে ঘা লাগলে এরকম রক্ত বেরোয়। আমি শুধু ভাবছি, কেন যে লোকটা মানুষের পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করতে যায়! যাই হোক, একটা দুর্ঘটনা যখন ঘটেছে, আমাদের অবশ্যই যাওয়া দরকার। ব্যস্ত হয়ো না তোমরা, আমরা আসছি।'

মেয়র ভারিক্কি চালে আসন ত্যাগ করলেন। 'কি পরিস্থিতি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আমাকে তাহলে আজকের মত রেহাই দিতে হয়। সরকারী দায়িত্ব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবার আগে পালন করতে হবে। ঘটনা সত্যি মারাত্মক, তদন্ত না করলে চলছে না। কাজেই অন্য সব কাজ স্থগিত থাকতে বাধ্য।'

গায়ে কোট চড়াচ্ছেন মেয়র। নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছেন, আমাদেরকে ঝেড়ে ফেলা গেছে। কিন্তু কামরা ছেড়ে তিনি বেরুতেই আমরা তাঁর পিছু নিলাম।

মেয়র রওনা হলেন বটে, কিন্তু অকুস্থলে পৌঁছুতে অকারণ দেরি করছেন। কেন দেরি করছেন, বুঝতে আমার অসুবিধে হলো না। বেস্টকে মারার জন্যে যারা দায়ী, তাদের চেহারা ভুলে যাবার জন্যে প্রত্যক্ষদর্শীদের সময় দিতে হবে না! হাতে আইন নিয়ে মেয়র পৌঁছুতে দেরি করলে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী অকুস্থল ছেড়ে চলেও যাবে যে যার পথে। এ-সব অতি নোংরা কৌশল।

নিজের বাড়ির সামনের একটা হলঘরে পড়ে আছে বেস্ট। সাধারণতন্ত্রের পতাকাটা ছিঁড়ে গেছে, দলা পাকানো অবস্থায় পাশেই দেখা যাচ্ছে সেটাকে। বাড়ির সামনে প্রচুর লোকজন ভিড় করেছে। কিন্তু 'প্রবীণ সামরিক সংঘ', যারা নিজেদেরকে 'লৌহসেনা' বলে পরিচয় দেয়, আশপাশে তাদের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। গেটে একজন পুলিসকে দেখা গেল, হাতে খাতা। সামনে পেয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন মেয়র।

'কি ঘটেছিল?'

পুলিস জবাব দেয়ার আগে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন মেয়র, 'ঘটনার সময় তুমি কি ছিলে ওখানে?'

মাথা নাড়ল পুলিস। 'না, আমাকে পরে খবর দিয়ে আনা হয়েছে।'

'ও। অর্থাৎ তুমি কিছু জানো না। ঘটনাটা নিজের চোখে ঘটতে দেখেছে, এমন কেউ আছে এখানে?'

ভিড় নড়ে না। জবাবও দেয় না।

মেয়র আবার জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কেউ জানো, আসল ঘটনাটা কি?'

জর্জ বলল, 'তদন্ত পরে শুরু করলে ক্ষতি কি? তার আগে ডাক্তার ডাকা উচিত নয়, হের মেয়র?'

ঘুরে তার দিকে কটমট করে তাকালেন মেয়র। 'ডাক্তার ডাকতে হবে? কেন? চোখে-মুখে পানি ছিটালেই তো হয়।'

'দেখতে পাচ্ছেন না, লোকটা মারা যাচ্ছে? এখুনি একজন ডাক্তারকে ডাকা উচিত...'

এতক্ষণে যেন মেয়রের হুঁশ হলো। ঝট করে বেস্টের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'মারা যাচ্ছে? কি বলে!'

'হ্যাঁ, মারাই যাচ্ছে। ইন্টারন্যাল ব্লিডিং, বুঝতে পারছেন না? আমার তো সন্দেহ, বেশ কয়েকটা হাড়ও ভেঙেছে। সম্ভবত সিঁড়ির মাথা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল ওকে...'

জর্জের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি দিয়ে মাপলেন মেয়র। 'আপনি বেশি কথা বলছেন, হের ক্রল। এরকম সিরিয়াস একটা ব্যাপারে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া উচিত নয়। লোকটার কি হয়েছে তা বলবার অধিকার রাখেন শুধু একজন ডাক্তার।'

'অথচ আমি বারবার বলা সত্ত্বেও সেই ডাক্তারকে আপনি ডাকছেন না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ডাক্তারকে ডাকা হবে কি হবে না, সেটা স্থির করব আমি। যেহেতু আপনি মেয়র নন, তাই আপনার কোন কথা এখানে খাটবে না।'

জর্জ আর আমি অপেক্ষা করছি। দেখা যাক মেয়র কি করেন।

সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই তরুণ। তাদের দিকে ফিরে কিছু চিন্তা করলেন মেয়র, তারপর বললেন, 'এই, যাও তো, ডাক্তার ব্রেডিয়াসকে ডেকে আনো। বলবে, একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে, এখুনি একবার দেখে যেতে হবে।'

অনুভব করলাম, জর্জ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

তরুণদের একজনেরই সাইকেলে চড়ে হাজির হলেন ডাক্তার ব্রেডিয়াস। সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে নামলেন, ছুটে ঢুকে পড়লেন সামনের হলঘরে। মাত্র দু'চার সেকেণ্ড দেখলেন বেস্টকে, তারপরই সিধে হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বিষণ্ন সুরে বললেন, 'আহাহা, মানুষটা তো আগেই মারা গেছে!'

'মারা গেছে!' হাঁ হয়ে গেলেন মেয়র।

'হ্যাঁ। আমাকে অনেক দেরি করে খবর দেয়া হয়েছে। আরও আগে পৌছাতে পারলে আমি হয়তো ওর চিকিৎসা করতে পারতাম। লোকটা বেস্ট না? ওর ফুসফুসই তো জখম হয়েছিল, তাই না?'

'অত সব খবর রাখি না!' মাথা নাড়লেন মেয়র, চেহারায় বিরক্তি। 'ফুসফুস কেন, আমার তো সন্দেহ হচ্ছে রোগ ছিল হার্টে। অসুস্থ হার্ট আকস্মিক আবেগের ধাক্কা সামাল দিতে পারেনি, তাই হয়তো...'

'আবেগের কারণে শরীরের ভেতর রক্তক্ষরণ হবে না,' ম্লান গলায় বললেন ডাক্তার ব্রেডিয়াস। 'কি ঘটেছিল বলুন তো?'

'তদন্ত করে সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি।' চারদিকে কড়া দৃষ্টি বোলালেন মেয়র। 'শুধু যারা সাক্ষ্য দিতে পারবেন তারা থাকুন, বাকি সবাই এখান থেকে চলে যান...'

কথা শেষ না করেই আমার আর জর্জের দিকে ঘুরলেন তিনি, সরাসরি তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন।

'একটু পরই আবার আমরা আসছি,' বললাম আমি। আরও কিছু বলবার জন্যে অদম্য একটা ঝোঁক চাপল, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সেটাকে কোনমতে ঠেকালাম।

তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন মেয়র, কথা বললেন না।

শুধু আমরা না, বাড়ির সামনে থেকে বেশিরভাগ লোকই কেটে পড়ল। সাক্ষী হওয়ার মত লোক ক'জন থাকল ঠিক বোঝা গেল না।

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে বসলাম আমরা, নাম নিডার স্টেকার হফ। ভয় হলো, জর্জকে নিয়ে না সমস্যায় পড়তে হয়। আগে কখনও তাকে এতটা রাগতে দেখিনি আমি।

মাত্র বসেছি, হঠাৎ এক তরুণ শ্রমিক এগিয়ে এল। সোজা হেঁটে এসে আমাদের পাশেই বসল সে। আমিই প্রথম কথা বললাম, 'ওখানে তুমি ছিলে নাকি?'

www.BanglaBook.org

'কিছুক্ষণ তো ছিলামই,' জবাব দিল সে।

'কি দেখলে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'দেখলাম লৌহসেনাদের উস্কানি দিয়ে উত্তেজিত করছেন উলকেনস্টাইন। বলছিলেন, বেস্টের বাড়িতে পতাকা উড়বে, আর আমরা তা মেনে নেব, এ কিভাবে সম্ভব? একই প্রশ্ন বারবার উচ্চারণ করছিলেন—ওই কলঙ্কচিহ্নটা মুছে ফেলা কি আমাদের কর্তব্য নয়?'

'পতাকাটা নামাবার জন্যে কে কে গেল? উলকেনস্টাইন গেলেন?'

'দূর, কি যে বলেন! উনি নিজে কখনও যান নাকি! লৌহসেনাদের প্ররোচিত করছিলেন। তারা সবাই একজোট হয়ে রণহুংকার ছাড়তে লাগল। ভাব দেখে মনে হলো যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। মিছিল করে বেস্টের বাড়ির দিকে এগোল সবাই। কেউ সুস্থ নয়, মদ খেয়ে একেবারে টং মাতাল হয়ে ছিল...'

'তারপর কি হলো?'

'এরপর নিজের চোখে কিছু দেখিনি আমি। তবে বেস্টকে একেবারে মেরে ফেলার ইচ্ছা ওদের সম্ভবত ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল খানিক উত্তমমধ্যম দেয়া। কিন্তু বেস্টকে চিনি তো, ভয় পাবার লোক নয় সে। অত মানুষ দেখেও ঘাবড়ায়নি, রুখে দাঁড়ায়। হয়তো পতাকাটা আগলাতে চেয়েছিল। লৌহসেনারা তখন ধাক্কা-টাক্কা মেরেছে। আর সেই ধাক্কা খেয়েই সিঁড়ির মাথা থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় বেস্ট। কি জানি, তার মাথায় দু'চারটে মুগুরও পড়ে থাকতে পারে। মাতালের মার, বোঝেনই তো। তবে না, বেস্টকে ওরা সত্যি মেরে ফেলতে চেয়েছিল কিনা তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমি শুধু আমার বিশ্বাসের কথা বলছি—হয়তো সেরকম ইচ্ছা ওদের ছিল না।'

'বলতে চাইছ এক হাত শিক্ষা দিতে চেয়েছিল, তার বেশি কিছু না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো?'

'বাহ্, এটা একটা খুন না! একজন মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে। মানুষটা কিভাবে খুন হলো তার খুঁটিনাটি সমস্ত দিক জানা দরকার। যত বেশি লোক জানবে তত ভাল।'

তরুণ শ্রমিক ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেল। গ্লাসের বিয়ারটুকু কোন রকমে গলায় ঢেলে চেয়ার ছাড়ল সে। 'আমি কিন্তু এ-ব্যাপারে কারও সঙ্গে কোন আলাপ করিনি। কারও সঙ্গে না মানে আপনাদের সঙ্গেও না। আরে ভাই, বিপদ হবে জানলে কে সত্যি কথা বলতে যাবে? আমার বউ-বাচ্চা আছে না? আমার যদি ভাল-মন্দ কিছু একটা হয়, তাদের কে দেখবে? না, ভাই, আমি সত্যি কিছু জানি না।'

লোকটা কেটে পড়ল। তাকে একা দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। আদালতে মামলা হলে সত্যি কথা বলার মত একজন লোকও পাওয়া যাবে না। সাক্ষ্য দিতে হলে সাহস দরকার হয়। আসলে যুদ্ধের পর থেকে সৎ-সাহসের প্রচণ্ড আকাল চলছে এ-দেশে। প্রায় নেই বললেই চলে।

হঠাৎ দেখি কি, রেস্তোরাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন মেজর উলকেনস্টাইন। গায়ে এখন সেই কাইজারী ইউনিফর্মটা নেই। হাতে একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাম্বিস ব্যাগ রয়েছে, ইউনিফর্মটা এখন তারই ভেতর।

'কোথায় যাচ্ছে বলো তো?' জর্জকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওয়ার্ডেনব্রাকে।'

'ওয়ার্ডেনব্রাকে কেন?'

'কেন মানে? মেজর তো ওখানেই এখন থাকেন। উসট্রিনজেনে এসেছিলেন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আবার আমরা হাজির হলাম মেয়রের অফিসে।

আমাদের দেখেই খেঁকিয়ে উঠলেন মেয়র। 'আশ্চর্য লোক তো আপনারা! এইমাত্র একজন মানুষ মারা গেল, তা জেনেও আবার তাগাদা দিতে চলে এলেন?'

'আমরা আসলে এখন আসিনি, আগেই এসেছি,' বলল জর্জ। 'সেই যে এসেছি, তারপর আর ফিরে যাইনি। কারণ খালি হাতে ফিরে যাবার যে উপায় নেই। মৃত্যু প্রসঙ্গ যখন তুলছেন, তখন বলতেই হচ্ছে–মৃত্যু থেকেই আমাদের ব্যবসার সৃষ্টি; সৃষ্টি ও স্থিতি, দুটোই তো!'

'আপনাদেরকে না আমি বলে দিয়েছি আগামী হপ্তায় আসতে হবে?'

'আমরাও তো বলে দিয়েছি, হের মেয়র, দামটা না পেয়ে ফিরতে পারছি না। আপনি যদি দাম না মেটান, শহরেই থেকে যাব আমরা। আরেক দিক থেকে তাতে সুবিধেই হবে। গোয়েন্দা পুলিশের অফিসে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারব।'

'সাক্ষ্য দিতে পারবেন? মানে?' বিস্ময়ের প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন মেয়র।

'সে যখন সময় হবে তখনই মানেটা টের পাবেন। বেস্ট খুন হয়নি? আপনি সেই খুনের তদন্ত করেননি? ওই খুন সম্পর্কেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন আমাদের কাছ থেকে।'

এবার একেবারে হিংস্রমূর্তি ধারণ করলেন মেয়র। কর্কশ গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তারমানে ভয় দেখাচ্ছেন? ব্ল্যাকমেইলিং করতে চাইছেন?'

'প্রশ্নটা করার আগে আপনার একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল, আপনাকে কি আমাদের ভয় দেখানোর প্রয়োজন আছে? ভয় দেখাবে বা ব্ল্যাকমেইল করতে চাইবে তারা, যাদের টাকা পাওনা নেই, অথচ আদায় করতে চাইছে। ভাল করে চিন্তা করে বলুন, আমরা কি আপনার কাছে টাকা পাই না?' জর্জও এবার মারমুখো ভঙ্গি নিয়ে ফেলেছে।

মেয়র দু'তিন বার ঢোক গিললেন। পানি অনেক দূর গড়াতে পারে, এটা বুঝতে পেরে ওই ঢোকের সঙ্গে রাগটাও সম্ভবত গিলে ফেললেন। চেয়ার ছাড়লেন, আলমারির দেরাজ খুলে টাকার বাণ্ডিলগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন টেবিলে।

জর্জ ভুলেও মেয়রের মুখের দিকে তাকাচ্ছে না, টাকার বাণ্ডিলগুলো গুনে গুনে ব্যাগে ভরতে ব্যস্ত সে।

টাকায় ভরে উঠল ব্যাগ। ব্যাগের মুখ বন্ধ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জর্জ।

তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন মেয়র। দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে বললেন, 'পানিতে বাস করবেন অথচ কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করবেন? ব্যবসার যে কি ক্ষতি হলো, সেটা পরে টের পাবেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কি ক্ষতি হলো?'

'উসট্রিনজেনে আর একটাও স্মৃতিফলক বেচতে পারবেন না।'

'আপনার ধারণা ভুল,' বলল জর্জ, চেহারা থমথম করছে। 'খুব শীগ্‌গির, কাল-পরশুর মধ্যেই এখানে একটা ফলক বসাচ্ছি আমরা। কার জন্যে বলুন তো? জ্বী-হ্যাঁ, বেস্টের জন্যে। ওই ফলকের কোন দাম নেব না।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে জর্জকে আমি বললাম, 'বিলের টাকা দেরাজেই ছিল দেখলাম।'

'থাকারই তো কথা। অর্ডার দেয়ার দিনই ফাণ্ড থেকে পুরো টাকা বের করে নিয়েছে ব্যাটা। নিজের কাছে রেখে অন্য ব্যবসায় খাটাচ্ছিল। আমাদের পাওনা মেটাতে যত দেরি করত, মার্কের দাম তত কমত, আমরা তত ঠকতাম। কিন্তু ওর পকেট ভারী হত।'

ছয়

জোছনায় সাদা হয়ে আছে রাতটা। জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে। বাগানে লিলাক ফুল ফুটেছে, তারই গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

আল্‌ফস্ট্যাণ্ডার হফ থেকে বাড়ি ফিরেছি এক ঘণ্টা আগে। রাত কম হয়নি, তবু ঘুমাতে যাবার কথা ভাবছি না। জানালায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছি, আমার মত আরও অনেকেই ঘুমাতে যাবার কথা ভাবছে না। আমাদের এই বাগান অবশ্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু তাসত্ত্বেও পড়শীরা এটাকে অনেক সময় ব্যবহার করে, বিশেষ করে রাতের বেলা। খোলা বাগান, ভেতরে ঢুকতে কোন অসুবিধে হয় না। চুপিচুপিই আসে তারা, সাবধানে ঘুরেফিরে বেড়ায়। বাগানটা বেশ বড়, এখানে সেখানে নানা আকৃতির পাথর পড়ে আছে। অর্ডার পেলে এই পাথরগুলো কেটেই বল্লম-গাঁথা সিংহমূর্তি বা তীরবিদ্ধ ঈগলমূর্তি তৈরি করবে কার্ট ব্যাশ। রাতে যারা চুপিচুপি হাওয়া খেতে ঢোকে বাগানে, ওই পাথরের ওপরই বসে তারা। খুব যেদিন গরম পড়ে, সেদিন বাগানের ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে শোয়ও অনেকে, দু'এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়। আজ রাতেও প্রতিবেশীদের আসা-যাওয়া লক্ষ করলাম। আগে কোনদিন মানা করিনি, আজও করব না।

এক লোককে দেখলাম বাগান থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তা পেরুতেও দেখলাম। ওয়াজটেক-এর বাড়ির সামনে সিঁড়ি আছে, তারই একটা ধাপে বসল। লোকটার পিছনে চাঁদ থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না।

খানিক পর অবাক হয়ে দেখি লোকটা আবার রাস্তা পেরুচ্ছে। আমাদের বাগানেই ঢুকল। ভঙ্গিটা অস্থির, পায়চারি করছে। মাতাল? নাকি কোন কারণে উদ্বিগ্ন?

না, মাতাল নয়। ওদেরকে দু'মাইল দূরে থেকে দেখলেও চিনতে পারি। এ লোকটাকে একটু খেপা খেপা লাগছে, যেন খুব রেগে আছে কারও ওপর। পা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেলছে খুব লম্বা করে। এভাবে শুধু তারাই হাঁটে যাদের হাত নিশপিশ করছে পরম শত্রুর মুণ্ডু একটানে ছিঁড়ে আনার জন্যে। লোকটা পায়চারি করছে, নাকি পাহারা দিচ্ছে? মতলবটাই বা কি? কাউকে খুন করতে চায়?

লোকটা আবার বাগান থেকে বেরোল। রাস্তা পেরিয়ে আবার বসল ওয়াজটেকের সিঁড়ির ধাপে। হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি। ও যীশু! ও মেরী! এ তো অন্য কেউ নয়, ওয়াজটেক নিজে!

এবার সে চাঁদের দিকে মুখ করে বসেছে। গোলগাল মুখটা স্পষ্টই এখন দেখতে পাচ্ছি।

ওয়াজটেক লোকটা কসাই।

রুগ্ন বা বয়সের ভারে শরীরে গাড়ি টানার আর শক্তি নেই, এরকম ঘোড়া কোচোয়ানদের কাছ থেকে কিনে নেয় পৌরসভা। কেনে খুব সস্তায়, বেচেও পানির দরে। তবে না, জ্যান্ত বেচে না। ধড়ে প্রাণ থাকতেই কেনে, বেচে মরা জিনিস। কেনে গোটা প্রাণীটাকে, বেচে কেটে টুকরো টুকরো করে। সারা দেশেই ঘোড়ার মাংসের দারুণ চাহিদা। দেশে তো কুকুর কম নয়–ব্ল্যাডহাউণ্ড, গ্রেহাউণ্ড, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, অ্যালসেশিয়ান। এরা সবাই মিলে মাংস কি কম খায়? ওদের ওই মাংসের চাহিদা মেটাবার জন্যেই পৌরসভাকে ঘোড়া কিনতে হয়। কসাইখানার একটা অংশ আলাদা করে দেয়া হয়েছে, সেখানে শুধু ঘোড়াই জবাই করা হয়। একদল কসাই প্রতি দিন সারা রাত ধরে সেখানে শুধু ঘোড়াই জবাই করছে। সেই দলেরই একজন হলো ওয়াজটেক।

মনটা খুঁত খুঁত করছে। রাতে তো কসাইখানায় ডিউটি দেয় ওয়াজটেক। এখন প্রায় বারোটা বাজে, এই সময় এখানে কি করছে সে? বাড়িতে কোন কাজ থাকলে বাড়ির বাইরে কেন ছটফট করবে?

লোকটার আচরণের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। একে তো কাজে যায়নি, তার ওপর খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। দুটো ব্যাপার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, অবশ্যই। সেই সম্পর্ক থেকে কিছু আবিষ্কার করা যায় না? বোধহয় যায়। ওয়াজটেক রেগে আছে। রাগটা অবশ্যই কোন মানুষের ওপর। আজ রাতে সে বাড়িতে আছে, কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে–কেন? কেন আবার, লোকটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবে, তাই!

ওই তো! ওই তো! ওর সঙ্গে লম্বা ছোরাটাও তো রয়েছে। কোমরের বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে, খাপে ভরা। ওই ছোরা দিয়েই ওয়াজটেক ঘোড়া জবাই করে।

তাহলে তো বিপদের কথাই। আজ রাতে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটবে। চিন্তা করছি আমি, দুয়ে দুয়ে চার মেলাবার চেষ্টা করছি। ওয়াজটেক কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করলেই কেউ তার হাতে খুন হতে আসবে কেন? ওয়াজটেক তাকে যদি আসতে বলে থাকে, তবু সে না-ও আসতে পারে। সেজন্যেই হয়তো অস্থিরতা বোধ করছে ওয়াজটেক। কিন্তু না, ঠিক নার্ভাস বলে মনে হচ্ছে না। তাকে বরং প্রচণ্ড রাগী একজন মানুষ বলেই মনে হচ্ছে।

ঘটনা একটা ঘটবে। ঘটবে এখানেই। তারমানে ওয়াজটেকের শত্রু এ-

www.BanglaBook.org

পাড়ারই লোক। সেজন্যে এখানে অপেক্ষা করছে ওয়াজটেক। অন্য পাড়ার লোককে খুন করতে হলে এ-পাড়ায় কেন ছটফট করবে সে?

অকস্মাৎ আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ওয়াজটেক জর্জকে খুন করবে না তো?

মনে পড়ল, ওদের মধ্যে একদিন ঝগড়া হয়েছিল। এটাই শুধু মনে আছে যে ঝগড়া একটা হয়েছিল। ঝগড়ার কারণটা মনে নেই। অতি তুচ্ছ কোন কারণই হবে, সেজন্যেই মনে নেই।

ওয়াজটেক যে বদমেজাজী মানুষ তা সবাই জানে। পশু জবাই করা তার সর্বশেষ পেশা হলেও, তাকে ঠিক জাত-কসাই বলা যায় না। তবে রাগটা কসাইসুলভই বলতে হবে। ঝগড়ার মধ্যে গলা চড়িয়ে বলেছিল, 'সাবধানে থাকিস, জর্জ! ঘোড়ার বদলে তোকেই একদিন জবাই করব!'

রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম আমি। কারণ জর্জ এখনও বাড়ি ফেরেনি।

জর্জ আর আমি, আমরা দু'জন একসঙ্গেই আলফ্স্ট্যাণ্ডার হফ-এ খেতে গিয়েছিলাম। খাওয়া শেষ করে ফিরব, এই সময় হঠাৎ আমাদের টেবিলে হাজির হলেন রিসেনডেল। ইনি হলেন বার্লিনের বাসিন্দা, আমাদের মহাজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। ওনার কোম্পানির নাম ওডেনওয়াল্ড গ্র্যানিট ওয়ার্কস। আমাদের ক্রল কোম্পানির বাগানে যত পাথর ছড়িয়ে আছে তার সবই আমদানি হয়েছে ওডেনওয়াল্ডের গোডাউন থেকে। নগদে নয়, ধারে কেনা হয়েছে। এই পাগলা ঘোড়ার মত অস্থির বাজারে ধারে ব্যবসা করতে পারা চাট্টিখানি কথা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, রিসেনডাল ভদ্রলোক সদয় বলেই এই মুদ্রাস্ফীতির ডামাডোলে আমাদের ছোট্ট ব্যবসাটা এখনও টিকে আছে, তা না হলে অনেক আগেই লালবাতি জ্বালার কথা।

তো তিনি এসে জর্জকে বললেন, 'ওহে, শোনো, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হয় যে!'

জর্জ তো যাবার জন্যে এক পায়ে খাড়া। রিসেনডাল ডাকলে যেতে আমাদেরকে হবেই, এমন কি নরকে হলেও।

'তুমি আবার কিছু মনে কোরো না হে,' আমার দিকে ফিরে বললেন রিসেনডাল, তারপর জর্জকে নিয়ে চলে গেলেন। আমি একা ফিরে এলাম বাড়িতে।

সে তো যা হবার হয়েছে। আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে এখনকার পরিস্থিতি নিয়ে। কসাই ওয়াজটেক ছোরা নিয়ে জর্জের ফেরার পথে অপেক্ষা করছে। লোকটা আমাদের বাগান আর নিজের বাড়ির সিঁড়ি, এই দুই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যাচ্ছে না। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, জর্জের জন্যেই অপেক্ষা করছে সে।

এখন হোক, পাঁচ মিনিট পর হোক, এক ঘণ্টা পর হোক, এই পথেই বাড়ি ফিরবে জর্জ। সে ফিরবে নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে। কেউ তাকে খুন করার জন্যে অপেক্ষা করছে, এটা সে জানে না। ওয়াজটেকের বাড়ির সামনে দিয়ে নিজের বাড়ির দরজায় আসতে হবে তাকে। আক্রমণটা তখনই হবে। প্রশ্ন হলো, কে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন জর্জকে রক্ষা করবে?

আগে থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু কিভাবে তা হওয়া যায়? ওয়াজটেক জর্জকে খুন করতে চায়, এটা তো আমার একটা সন্দেহ মাত্র। সন্দেহের বশে এই রাত দুপুরে আমি একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতে পারি না। চেঁচামেচি করে যাদের ডাকব তারা আমাকে জিজ্ঞেস করবে, কেন আমি ভাবছি ওয়াজটেক জর্জকে খুন করবে? তারা প্রমাণ চাইবে। ওয়াজটেক অস্থির হয়ে আছে, এটা তার কোন অপরাধ নয়, তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণও নয়। শেষে সবাই আমাকে গাধা বলে গাল দেবে।

না, আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই।

ওয়াজটেকের বিরুদ্ধে কিছু করা যাচ্ছে না। কেননা, এখন পর্যন্ত সে কোন অপরাধ করেনি। খুব ভাল হত যদি জানতাম রিসেনডাল জর্জকে কোথায় নিয়ে গেছেন। ঠিকানাটা জানা থাকলে ছুটে গিয়ে তাকে বলতাম, আজ রাতে তার বাড়ি ফেরার দরকার নেই। কিংবা বিশ্বস্ত কয়েকজন বন্ধু যোগাড় করতাম, তাদেরকে নিয়ে নিশ্ছিদ্র একটা বেড়া তৈরি করতাম জর্জের চারধারে, বাড়ি ফিরিয়ে আনতাম নিরাপদে। কিন্তু এ-সব কথা ভেবে লাভ কি, সে কোথায় গেছে তা-ই তো জানি না। ওয়ার্ডেনব্রাকে হোটেল আর নাচ ঘরের সংখ্যা সব মিলিয়ে আটচল্লিশটা। রিসেনডাল তাকে কোনটায় নিয়ে গেছেন কে জানে।

অস্থির হয়ে উঠলাম। জানালায় দাঁড়িয়ে কপাল চাপড়াচ্ছি। কি করি! কি করি!

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। আরে, এত কঠিন সমস্যার সমাধান দেখছি পানির মত সহজ! ওয়াজটেক জর্জকে খুন করতে চায়, আমাকে নয়, ঠিক আছে? কাজেই ওয়াজটেকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার কোন অসুবিধে নেই। ওর সামনে দাঁড়াব, ওর সঙ্গে কথা বলব। জর্জকে যখন সাবধান করা সম্ভব হচ্ছে না, চেষ্টা করব ওয়াজটেককেই তার বাড়ির সামনে থেকে অন্য কোন দিকে সরিয়ে নিতে। ওর প্রতিহিংসা আর আমার চতুরতা, এই দুইয়ে লাগুক টক্কর! দেখা যাক কোনটা জেতে।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। শান্ত, অলস পায়ে। চাঁদের আলোয় চারদিকে ঝলমল করছে। একটু দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলাম, আয়েশ করে হাই তুললাম বার কয়েক। তারপর এমন ভান করলাম, যেন এই মাত্র হঠাৎ ওয়াজটেককে দেখতে পেয়েছি। কয়েক পা এগোলাম তার দিকে। বললাম, 'রাতটা দারুণ, তাই না? এত সুন্দর রাত অনেক দিন দেখিনি।'

'কি? রাত? ও, হ্যাঁ, রাত।' অন্যমনস্ক ছিল ওয়াজটেক, আমি কি বলছি বুঝতে পেরে সায় দিল। গলায় কিন্তু বেশ রাগ। কথা এখনও তার শেষ হয়নি। হিস হিস করে আবার বলল, অনেকটা নিশ্বাসের সঙ্গেই, 'সব ভেঙে চুরমার করা হবে! সব পুড়িয়ে ছাই করা হবে!'

ভাঙচুর করবে বলছে! বলছে সব পুড়িয়ে ফেলবে! নিশ্চয়ই জর্জকে পোড়াবে, তাই না? কী সাঙ্ঘাতিক, ওয়াজটেক শুধু খুন করবে না, জর্জের বাড়ি-ঘরও ভাঙচুর করবে! একটা কিছু বলতে হয় আমাকে। কিন্তু আমার তরফ থেকে জর্জের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রসঙ্গটা এখুনি না তোলাটাই বোধহয় ভাল। ন্যাকা সাজতে হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ভাঙচুর করবে, ওয়াজটেক? কাকে পোড়াবে, ভাই?'

'এই শয়তানি, এই হারামিপনা বেশিদিন সহ্য করা হবে না! এর একটা বিহিত এবার হতেই হবে!'

একটা খটকা লাগল। ওয়াজটেক মুদ্রাস্ফীতির কথা বলছে না তো? গলায় উৎসাহ এনে বললাম, 'ঠিক বলছ তুমি, ওয়াজটেক। এই শয়তানি সহ্য করা আর সম্ভব নয়। অবশ্যই একটা বিহিত হওয়া দরকার। এই যে মার্কগুলো ঘণ্টায় ঘণ্টায়...'

'ওদের হারামিপনা মানি না, মানব না! সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে!'

'কি মানবে না, ভাই?' জিজ্ঞেস করলাম নরম সুরে। 'তুমি কি প্রসঙ্গে কথা বলছ?'

'প্রসঙ্গ তো একটাই, এই সব বদমায়েশি! অনেক সহ্য করা হয়েছে, আর নয়...'

বদমায়েশি? কার? উফ্, কোমরের ছোরাটা কী সাংঘাতিক লম্বা রে বাবা! কোপ একটা দিতে যা দেরি, জর্জের গলা সঙ্গে সঙ্গে দু'টুকরো। সিদ্ধান্ত নিলাম, জর্জের নামটা ভুলেও উচ্চারণ করা চলবে না। আমার মুখে জর্জের নাম শুনলেই আমাকে সন্দেহ করবে ওয়াজটেক, তখন আর আমার সঙ্গে কোথাও যেতে রাজি হবে না।

ওয়াজটেক চুপ করে আছে। কিছু একটা আমার বলা দরকার। কি বলি! কি বলি! যাই বলি, সেটার যেন অনেক অর্থ করা যায়।

বললাম, 'হ্যাঁ, সত্যি তাই, অনেক সহ্য করা হয়েছে এই সব বদমায়েশি...'

আমার কথা ওয়াজটেক শুনছে বলে মনে হলো না। সে তার নিজের খেয়ালে রয়েছে। কর্কশ গলায় শুনিয়ে দিল, 'প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত! এবার প্রায়শ্চিত্তের পালা! একজন অপরাধীও রেহাই পাবে না!'

খুব মনোযোগ দিয়ে ওয়াজটেককে দেখছি। প্রতিবেশী হলেও, এতদিন তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করার কোন কারণ ঘটেনি। দেখছি আর হিসাব কষছি। শক্তি পরীক্ষা হলে কে জিতবে। হামলা করার সুযোগ যদি ওয়াজটেক পেয়েই যায়, সেই হামলা থেকে নিজেকে বাঁচাবার সম্ভাবনা কতটুকু জর্জের?

মনে মনে হতাশ বোধ করলাম। জর্জের রেহাই পাবার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তার বয়েস চল্লিশ পুরো হয়ে গেছে। জর্জ তো দূরের কথা, পঁচিশ বছরের তরুণ আমিও ওয়াজটেকের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় হেরে যাব। শেষ পর্যন্ত আমাকে যদি লড়তেই হয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়তে হবে। ওয়াজটেককে দেখতে দেখতে একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল—জিততে হলে কৌশল করতে হবে। তা-ও শুধু কৌশলে কাজ হবে না, ভাগ্যেরও সহায়তা দরকার হবে। ভাগ্যগুণে আমি যদি ওয়াজটেকের চিবুকে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড একটা গুঁতো মারতে পারি, কাজ হবে। কিংবা যদি তার তলপেটে ঝেড়ে একটা লাথি মারতে পারি, কাজ হতে বাধ্য। আর যদি এমন হয়, হঠাৎ পা পিছলে দড়াম করে পড়ে গেল সে, তাতেও আমার জেতাটা নিশ্চিত হয়। তখন আমি পিঠের ওপর জুত

www.BanglaBook.org

করে বসে ওর মাথাটা ফুটপাথে ঘন ঘন ঠুকে দিতে পারি।

কিন্তু এ-সবও তো সাময়িক! ওয়াজটেক যেমন জর্জকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলতে চায়, আমরা সুযোগ পেলেও সে কাজটি করতে পারব না। বড়জোর তাকে আহত করতে পারি। কিন্তু এক সময় সে দাঁড়াবে, তাই না? নিজের শক্তি ফিরে পাবে, তাই না? বারবার তো আর ভাগ্যের সহায়তা আশা করা যায় না। প্রশ্ন হলো, তখন কি হবে?

এই সব চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি, ওয়াজটেক জিজ্ঞেস করল, 'কি বললেন, শুনলেন? শুনলেন ওঁর কথাগুলো?'

'কথা? কার কথা?'

'বাহ্! বাহ্! যেন কিছুই জানেন না! আরে, আর কার কথা বলব! আর আছেনই বা কে? ওই একজনই তো! মন দিয়ে শুনতে হয়, এমন কথা তিনি একাই তো বলছেন ইদানীং, তাই না?'

আমি সাবধান হয়ে গেছি। না বুঝে কিছু বলা ঠিক হবে না। ওয়াজটেক কার কথা বলছে বুঝতে পারছি না। কে সে? কি করে? শোনার মত কথা বলে—কি কথা? কখন বলেছে? কাকে বলেছে? কোথায় বলেছে? কিছুই যখন জানা নেই, ঠোঁট ফাঁক করাটা বোকামি। যা কিছু জানাবার, এখন ওই ওয়াজটেকই জানাবে।

রাস্তা নির্জন। কোথাও কোন শব্দ নেই। ভাগ্যটাও ভাল, জর্জ এখনও ফিরছে না। এখন আমার একটাই কাজ, কথায় কথায় ওয়াজটেককে ভুলিয়ে রাখা। সময় নষ্ট করাই। বিপদ যখন আসবে, তা থেকে বেরুবারও একটা উপায় ঠিকই পাওয়া যাবে।

'বাহ্! যেন কিছুই জানেন না!' বিড়বিড় করল ওয়াজটেক।

সুযোগ ছাড়ি না। 'কার? কার কথা বলছ, ভাই? আজকাল শোনার উপযুক্ত কথা কে বলছেন? সত্যি আমি শুনিনি। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বঞ্চিত হয়েছি। কে ভাই সে?'

ওয়াজটেককে দেখে আমার মনে হলো, সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না—কাঁদবে, নাকি হাসবে? 'আরে! আমার সামনে তুমি কে দাঁড়িয়ে আছ—জ্যান্ত, নাকি মড়া? অবাক করলে! সত্যি অবাক করলে! এখনও জিজ্ঞেস করছ কার?'

সবিনয়ে বললাম, 'না জানাটা সত্যি আমার অপরাধ। কে, ভাই? কার কথা বলছ তুমি?'

'হিটলার! হিটলার! অ্যাডালফ্ হিটলার!' গলা সপ্তমে চড়ছে ওয়াজটেক। 'ফুয়েরার! ফুয়েরার!'

'অ্যা-ডা-ল-ফ্ হি-ট-লা-র!' চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করলাম। 'ও, আচ্ছা, তার কথা বলছ তাহলে। ও আচ্ছা!'

'এত আচ্ছা আচ্ছা করছ কেন?' প্রায় মারমুখো হয়ে উঠল ওয়াজটেক। 'তুমি কি তাঁকে সমর্থন করো না? অ্যাঁ? স্পষ্ট করে জবাব দাও। হ্যাঁ বা না। তুমি হিটলারের পক্ষে নও?'

'কি যে বলো না! হিটলারের পক্ষে নয় এমন কেউ আছে নাকি!' এবার আমার উৎসাহ বাঁধ ভাঙা বন্যার মত ছুটল। আমি যে হিটলারের কী রকম উগ্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমর্থক, সেটা ব্যাখ্যা করতে না পারার জন্যে ভাষার দুর্বলতাকে দায়ী করলাম। বললাম, হিটলারের পক্ষে না থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। হিটলার ছাড়া আর কে আছেই বা!

'সোজা পথে এসো, হ্যাঁ। তবু আমার খটকা লাগছে। তুমি যদি হিটলারের সমর্থকই হবে, তাহলে তার ভাষণ শোনোনি কেন?'

'ভাষণটা...মানে...'

'তুমি বোধহয় এ-ও জানো না যে হিটলার একটা ভাষণ দিয়েছেন, তাই না?'

এখন চুপ করে থাকাটাও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। 'না জানাটা বোধহয় অপরাধই হয়ে গেছে...'

'অবশ্যই অপরাধ হয়ে গেছে! উনি রেডিওতে বক্তৃতা দিয়েছেন। অথচ তুমি শোনোনি!'

'দেখো ভাই, স্বীকারই তো করছি আমার অপরাধ হয়ে গেছে। তাছাড়া, জানলেও বক্তৃতাটা আমার শোনা হত না। কারণ আমার রেডিওটা নষ্ট হয়ে গেছে। ভাই ওয়াজটেক, তুমিও তো আমাকে একবার ডাকতে পারতে। তোমার ঘরে বসেই শুনতে পারতাম...'

'আরে, দূর, না! আমি কি নিজের বাড়িতে বসে শুনেছি? আমাদের ঘোড়ার আস্তাবলে রেডিও আছে না ছয় টিউবের, ওটা থেকে শুনেছি। সে কি বক্তৃতা রে ভাই! আমার শরীরের রক্ত গরম আগুন হয়ে উঠল। বক্তৃতা শেষ হবার পর শ্লোগান দিতে দিতে কসাইখানা থেকে মিছিল করে বেরিয়ে এলাম সবাই আমরা, আজকের মত ছুটি নিয়ে।'

'ছুটি নিয়েছ ভাল করেছ। কিছু ঘোড়ার আয়ু খানিকটা বাড়ল। কিন্তু বক্তৃতার কথা শোনাও। কি বললেন উনি? হিটলার?'

'ঘোষণা দিলেন, সমস্ত নোংরামি আর বদমায়েশি অবশ্যই তিনি বন্ধ করবেন। সে যে কি বক্তৃতা, না শুনলে তুমি বুঝবে না—একেবারে রোমহর্ষক ভাষণ! সরকার যে কোথায় কি ভুলভাল করছে, মানুষটা তার খুঁটিনাটি সব খবর রাখেন। গোটা কাঠামোটাই বদলে ফেলতে হবে, বলছেন ফুয়েরার। সব নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।'

'তাহলে তো ভালই,' সায় দিয়ে বলি আমি। সব নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। আমূল সব বদলে ফেলতে হবে। গোটা কাঠামো বাতিল করতে হবে। দুনিয়ার সব মোড়লরাই এই কথা বলতে পছন্দ করে। 'ওয়াজটেক, চলো না ভাই। বেশি দূরে না, ব্লুম-এর হোটেল তো কাছেই। টেবিলে বসে বিয়ার খাই, আর তোমার মুখ থেকে ফুয়েরারের কথাগুলো শুনি। আমারই ভুল, কখন বক্তৃতা হবে খবর রাখিনি। তাই রেডিওটাও মেরামত করা হয়নি। এখন তুমি যদি এটুকু সাহায্য না করো, আমি বঞ্চিতই থেকে যাব...'

'এত করে যখন বলছ, বেশ, চলো তাহলে। ফুয়েরারের বক্তৃতা পুনরাবৃত্তি করা, এ তো দেশপ্রেমিকদের কর্তব্যই। তুমি যে শুনতে চাইছ, এটাও তোমার দেশপ্রেম...'

ওয়াজটেক রওনা হলো আমার সঙ্গে। হিটলারের বক্তৃতা হিটলারী ঢঙেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে। তা আসুক, এ অত্যাচার আমার সইবে। আমি শুধু ওকে ব্লুম রেস্তোরাঁয় ঘণ্টাখানিক আটকে রাখতে চাই। আশা করা যায়, ওই এক ঘণ্টার মধ্যে জর্জ বাড়িতে ফিরে আসবে।

পরদিন এক লাফে বিশ হাজার মার্ক বেড়ে গেল ডলারের দাম। ওয়াজটেকের মুখে হিটলারের হুমকি শুনেছি কাল রাতে, 'গোটা কাঠামোটাই বদলে ফেলতে হবে'। তখন নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল কথাটা। কিন্তু আজ বিশ হাজারী লম্ফের মুখে দাঁড়িয়ে আমি অন্য একটা তাৎপর্য উপলব্ধি করছি।

গোটা বা আমূল না হোক, অন্তত আংশিক একটা পরিবর্তন সত্যি দরকার। অবশ্য সে পরিবর্তন হিণ্ডেনবুর্গই আনতে পারেন। হিটলারের মত দায়িত্বজ্ঞানহীন বেপরোয়া একজন চরমপন্থীকে ডেকে এনে সে-কাজের ভার দেয়ার কোন মানে হয় না।

পাগলাগারদে আজকাল সন্ধ্যায়ও প্রার্থনার আয়োজন করা হচ্ছে। আমাকেই অর্গান বাজাতে হয়। সেজন্যে হাজার মার্ক দক্ষিণা পাচ্ছি। কিন্তু হাজার মার্কে কাচের তৈরি এক সেট বোতামও কেনা যায় না। তবু কাজটা আমি ফিরিয়ে দিইনি। এই খণ্ডকালীন চাকরির উপরি পাওনা হলো প্রার্থনার পর নৈশভোজটা গির্জা সংলগ্ন ক্যান্টিনেই সারা যায়। আজকাল সেটার মূল্যও অনেক।

আজ একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি। শেষ বিকেলের আলো গির্জার বাগানটাকে কেমন রহস্যময় করে তুলেছে। আশ্রমের বাসিন্দারা পাহারাদারদের সঙ্গে বাগানে বাতাস খেতে এসেছে। ওই যে, আমার ডান দিকে যে লোকটা রয়েছে, ওকে আমি চিনি। লোকটার ধারণা, তার মাথা কাঁচ দিয়ে তৈরি, সাবধানে নাড়াচাড়া না করলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এখন বুঝতে পারছেন, কেন সে ফুলগাছের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে? যতক্ষণ বাগানে থাকবে, সে নড়বে না। মাথার খুব মূল্য দেয় সে, চায় না ভেঙে যাক।

আর একজন, অতি সাধারণ লোক, কিন্তু তার বিশ্বাস সে মোটেও সাধারণ কেউ নয়–সে হলো সপ্তম গ্রেগরি, রোমের পোপ। তার আজকের এই অবস্থার জন্যে দায়ী এক জালিয়াত। সেই তো আশ্রম কর্তৃপক্ষকে টাকা দিয়ে তাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে। তার পরিচয় নিয়ে জালিয়াত লোকটা চলে গেছে ভ্যাটিকান প্রাসাদে, সেখানে পোপ হিসেবে সবার কাছ থেকে সম্মান আদায় করছে। ওই যে, বাদামবীথির ভেতর হাঁটাহাঁটি করছেন সপ্তম গ্রেগরি, কেমন স্থির ও দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটছেন, লক্ষ করুন! নিশ্চয়ই নিজের বন্দীত্ব মোচনের কি ব্যবস্থা করা যায় ভাবছেন। তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে হবে তো! তবে সবাইকে তিনি আশ্বাস দেন, একদিন ঠিকই রোমে ফিরে যাবেন, নিজের মাথায় আবার পরবেন ত্রিমুকুট।

আমি একটা বেঞ্চে বসে আছি। একই বেঞ্চে বসেছে আরও দু'জন। দু'জনেই অনর্গল কথা বলছে। দু'জন একসঙ্গেই বলছে, কেউ কারও কথা শুনছে বলে মনে হয় না। অথচ পরস্পরকে বোঝাচ্ছে তারা, কি করে তারা পাগল হলো।

ফুলগাছে পানি দিচ্ছে তিনটে মেয়ে। ওদের পরনে ডোরাকাটা পোশাক।

www.BanglaBook.org

নিঃশব্দে কাজ করছে ওরা।

গোটা বাগানে কোন উত্তেজনা-উদ্বেগ নেই। শান্তিময় পরিবেশ। ডলার যতই লাফ দিক, এখানকার এরা কেউ সেজন্যে চিন্তিত নয়। মার্কের দাম পড়ে যাচ্ছে, যাক, সেজন্যে কেউ এখানে গলায় দড়ি দিতে চাইবে না।

হ্যাঁ, টাকার শোকে সত্যি দু'জন গলায় দড়ি দিয়েছে কাল রাতে। দিয়েছে এই শহরেই। আমি যখন ওয়াজটেককে নিয়ে ব্লুম-এ বসে বিয়ার খাচ্ছিলাম, তখনকার ঘটনা। দু'জনেই তারা বুড়ো-বুড়ি, স্বামী ও স্ত্রী। ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি কিনেছে, মূল্য হিসেবে পরিশোধ করেছে জীবন। কাপড় শুকাবার রশি গলায় পেঁচিয়ে ঝুলে পড়েছিল।

রশিতে কোন কাপড় ছিল না, ঝুলছিল শুধু ওই শরীর দুটো। কাপড়চোপড় থাকবে কিভাবে, সবই তো তার আগে বিক্রি করে পেটের খিদে মিটিয়েছে। শুধু যে কাপড়চোপড়, তা নয়, সমস্ত আসবাব-পত্রও বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। ওগুলো নিতেই এসেছিল দোকানদার, এসে দেখে রশিতে ঝুলছে বুড়ো-বুড়ির লাশ।

ওরা একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। লিখেছে, ইচ্ছে ছিল ফুসফুসে গ্যাস টেনে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু এমনই তাদের দুর্ভাগ্য যে ঠিক সেদিনই গ্যাস কোম্পানির লোকজন লাইন কেটে দিয়ে গেছে। লাইন কেটেছে বিল মেটানো হয়নি বলে। কাজেই বাধ্য হয়ে তাদেরকে গলায় রশি দিতে হলো।

সাত

আজ নীল স্কার্ট পরেছে ও। ব্লাউজটা হলুদ। গলায় কমলা রঙের নেকলেস। দূর থেকেই দেখতে পেলাম ওকে। এদিকেই আসছে ইসাবেল।

পরপর কয়েকটা সকাল ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কারণ প্রার্থনার পরপরই গির্জা থেকে সরাসরি বাড়ি চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। সকালের নাস্তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে ভাল লাগেনি আমার। এত লোভনীয় নাস্তা কোনদিনই এডওয়ার্ড আমাকে পরিবেশন করতে পারবে না। কুপনের বিনিময়ে তো নয়ই, নগদ টাকা দিলেও নয়।

যখনই দেখা হোক, প্রতিবার ইসাবেল জিজ্ঞেস করবে, 'এই যে সাহেব, এতদিন কোথায় ছিলেন?' আজও জিজ্ঞেস করল।

হাত তুলে বাইরের দিকটা দেখালাম ওকে। 'ওই ওদিকে। যেখানে দরকারী বলতে একটা জিনিসকেই বোঝায়, তা হলো টাকা।'

ইসাবেল বেঞ্চের হাতলে বসল। বসেই অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল। 'আচ্ছা, বলতে পারেন, শিশুরা কেন মরে?'

বেঞ্চে আরও দু'জন বসেছিল, বিরক্ত হয়ে উঠে গেল তারা। আমি ইসাবেলের দিকে তাকালাম না। তবে তার প্রশ্নের জবাব দিলাম, 'আমি জানি না, ইসাবেল।'

'আমার প্রশ্ন হলো, এত তাড়াতাড়ি মরবেই যদি, কি দরকার ছিল জন্মাবার?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'প্রশ্নটা তুমি পাদ্রী বোডেনডিককে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তাঁর বক্তব্য হলো, ঈশ্বরের প্রতিটি কর্ম হিসাব করা। হিসাব ছাড়া কিছুই তিনি করেন না। ধরো কোন লোকের মাথা থেকে একটা চুল খসে পড়ল, বুঝতে হবে সেটারও একটা উদ্দেশ্য আছে, আছে একটা বিশেষ তাৎপর্য ও অর্থ। ঈশ্বর তাঁর প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে মানুষকে নীতি শিক্ষা দিচ্ছেন।'

হেসে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হলো ইসাবেলের। 'কি বললেন? ঈশ্বর হিসাব করেন? কিন্তু তা কি করে হয়! সবই যখন তাঁর জানা, তাহলে হিসাবের দরকারটা কি?'

'হ্যাঁ, সব তাঁর জানা বৈকি!' কোন কারণ ছাড়াই রেগে উঠি আমি। 'তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, তিনি করুণাময়। অথচ দেখো, শিশু তো মরছেই, যে মাকে ছাড়া শিশু বাঁচে না সেই মাও শিশুকে ফেলে মরে যাচ্ছে। এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো দুনিয়াতে এত দুঃখ কেন। তোমার এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র সর্বজ্ঞই জানেন, অন্য কারও কিছু জানা নেই।'

ইসাবেল খানিকটা চমকে উঠল, যেন নতুন কোন কথা শুনেছে। এখন আর সে হাসছে না। চেহারা দেখে মনে হলো, যেন খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। 'আচ্ছা, রডল্ফ! মানুষগুলো যদি সবাই সুখী হত? কি সমস্যা ছিল সুখী হলে?'

'জানি না, ইসাবেল। তবে এটা বোধহয় ঠিক যে সবাই সুখী হলে ঈশ্বরকে আর কেউ ডাকত না। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের কদর কমে যেত।'

আরেকবার চমকে উঠল ইসাবেল। 'ঠিক!' চিৎকার করে উঠল সে। 'মানুষ সুখী নয়, তার জন্যে দায়ী ঈশ্বরের ভীতি। দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরকে ডাকে মানুষ, প্রার্থনা করে। আর সেজন্যেই ঈশ্বর বাধ্য হন মানুষকে দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে রাখতে। তবে সুখী মানুষও মাঝে মধ্যে ঈশ্বরকে ডাকে বটে। ডাকে এই ভয়ে যে তার হয়তো এত সুখ সইবে না।'

আমি কিছু বলছি না। সম্ভবত চুপ করে থাকাতেই আমার ওপর বিশেষ মনোযোগ দিল ইসাবেল। 'ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করছি। করি?'

'করো।'

'আপনার ভয় করে না?'

'কি জানি। হয়তো করে। যুদ্ধের সময় তো মাঝে মধ্যে সাংঘাতিক ভয় পেতাম।'

'আরে না, সে ভয়ের কথা বলছি না। আপনি যে ধরনের ভয়ের কথা বলছেন সেগুলোর তো কোন না কোন ভিত্তি আছে। আমি ভিত্তিহীন, অমূলক ভয়ের কথা জানতে চাইছি। অকারণ ভয়। নাম-না-জানা ভয়।'

'তারমানে মরণের ভয়?'

ইসাবেল মাথা নাড়ল। 'না। আমি মৃত্যুভয়ের কথাও বলছি না। আরও পুরানো, সম্পূর্ণ অন্য রকম একটা ভয়...'

'হারিয়ে যাবার ভয়?'

আবারও মাথা নাড়ল ইসাবেল। আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করি না। মনে প্রশ্ন জাগে, ইসাবেল কি সত্যিই পাগল?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় চুপচাপ পাশাপাশি বসে আছি দু'জন। আলোচনায় স্পষ্ট হয় না কোন সমস্যাই, সব যেন আরও তালগোল পাকিয়ে যায়, তাই কথা আর বাড়তে দিচ্ছি না।

ইসাবেল নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'একদম চুপ করে গেলেন যে?'

'কথা বলে কি হয়? কথার কি দাম?'

'অনেক দাম! অনেক, অনেক, অনেক! আপনি কি কথাকে ভয় পান?'

একটু চিন্তা করে উত্তর দিতে হয়। এক সময় বললাম, 'কথাকে কমবেশি সবাই ভয় পায়। যেখানে দেখবে বড় বড় কথা ব্যবহার করা হচ্ছে, ধরে নেবে সেখানে অবশ্যই বড় বড় মিথ্যেকে চাপা দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে।'

'তবু, কথা ছাড়া মানুষ বাঁচবে না।'

হঠাৎ চারপাশটা বড় বেশি নিস্তব্ধ লাগল। ফুলের কেয়ারি থেকে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ উঠছে। একটা পাখি ডাকল বাদাম গাছের ডাল থেকে। এই একই ডাক চিরকাল ডাকছে ওরা। শান্ত এই সন্ধ্যায় দাঁড়িপাল্লার দু'দিকেই যেন সমান ওজনে ঝুলছে পৃথিবীটা। সেই পাল্লার দাঁড় আমার বুকেও, অথচ তার চাপ এতটুকু অনুভব করছি না। ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলতে থাকো, তাহলেই আর চিন্তা নেই...

'আপনি কি আমাকেও ভয় পান?' আমার কানে ফিসফিস করল ইসাবেল।

আমি শুধু মাথা নাড়লাম, জবাব দিলাম না। মনে মনে বললাম, 'মানুষের সমাজে তুমিই একমাত্র মানুষ, যাকে আমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তুমি, ইসাবেল, এমন এক জগতের বাসিন্দা, যেখানে কথা আর অনুভূতি, মিথ্যা আর সত্য, বাস্তবতা আর স্বপ্ন সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে, কোনটাকেই আলাদা করবার উপায় নেই।'

ইসাবেল বেঞ্চের ওপরই ঢলে পড়েছে। চারদিক গাঢ় হয়ে সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। সেই লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, যে মনে করে তার মাথা কাঁচ দিয়ে তৈরি। আশপাশের বেঞ্চের কয়েকজন বুড়ো-বুড়ি বসেছিল কুঁজো হয়ে, কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। একজন নার্স এসেছে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে। সেই নার্সই আমাদেরকে বলে গেল, 'সময় কিন্তু ফুরাল।'

মাথা ঝাঁকালাম। কথা বলছি না।

ইসাবেল কানের কাছে ফিসফিস করল, 'ওরা আমাকে ডাকছে।'

আমি ওকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিই। ক্লান্ত শিশুর মত লাগছে ওকে, একটু একটু হাঁপাচ্ছে। একা ছাড়তে পারি না, ধরে ধরে মেয়ে-মহলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। হাঁটার সময় কি মনে করে দু'হাতে শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরল ও। নিচু গলায়, যেন গোপনে, সারাক্ষণ কি যেন বলছে আমাকে। দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখি ছোট্ট চাতালটা আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। আমি ওকে একটা বেতের চেয়ারে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিলাম।

চোখ বুজে বসে থাকল ও। বসে আছে তো বসেই আছে। কতক্ষণ পর বলতে পারব না, একজন নার্সকে আসতে দেখলাম। সে-ই ওকে ভেতরে নিয়ে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আশ্রমের পরিচালিকা নিজের তরফ থেকে অতিরিক্ত এক বোতল মোজেল পাঠিয়েছেন, কিন্তু তাসত্ত্বেও টেবিল ছেড়ে চলে গেলেন পাদ্রী বোডেনডিক। টেবিলে এখন শুধু আমি আর ডাক্তার ওয়ার্নিক। আমি কি সহজে উঠি! পেট পূজাটা মনের আশ মিটিয়ে সারা যাবে বলেই তো সন্ধেবেলার এই চাকরিটা করি।

পাগলাগারদে কিছু রোগী আছে যাদের রোগ এমনই মারাত্মক যে কোনদিন সারবে না। তাদের প্রসঙ্গেই ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। ডাক্তারই বলছিলেন, আমি চুপচাপ শুনছিলাম। হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। ফস করে জানতে চাইলাম, 'যাদের ভাল হবার কোন আশাই নেই, তাদেরকে মেরে ফেলতে দোষ কি বলুন তো? স্রেফ একটা ইনজেকশন দরকার, তাই না?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু না বলে আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলেন ডাক্তার ওয়ার্নিক। তারপর জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তোমার হাতে দায়িত্ব বা ক্ষমতা থাকলে তুমি বুঝি মেরেই ফেলতে?'

'সে ক্ষমতা যখন আমার নেই, কি করতাম বলা সত্যি কঠিন। তবে সহজ যুক্তি কি বলে, ডাক্তার ওয়ার্নিক? মৃত্যু যার ঘটবেই, কিন্তু যে-কদিন বেঁচে আছে তার প্রতিটি মুহূর্ত অসহ্য কষ্ট পাচ্ছে, সেই কষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করার কোন উপায়ই নেই, এরকম অবস্থায় একটা ইনজেকশনের সাহায্যে তাকে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়ার মধ্যে কি দোষ থাকতে পারে, বলুন?'

ডাক্তার দ্বিধায় পড়ে চুপ করে আছেন।

'আপনাকে আমি যুদ্ধের সময়কার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার এক সহযোদ্ধার পেট চিরে দু'ফাঁক হয়ে গেল। কসাইয়ের দোকানে গরু-ছাগলের পেট চিরে যেভাবে দু'ভাগ করে রাখা হয়, ওরকম। বন্ধু মিনতি করছে, "আমাকে মেরে ফেলো! আমাকে মেরে ফেলো!" কিন্তু কে মারবে? স্রেফ একটা বুলেট দরকার ছিল। কিন্তু কে গুলি করবে? আমরা কি করলাম? তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

'হাসপাতালের বেডে তিন দিন পড়ে পড়ে আর্তনাদ করল সে, তারপর মারা গেল। এবার ভাবুন, ডাক্তার ওয়ার্নিক। তিনদিন কম সময় নয়, যদি এই তিনদিনের প্রতিটি মুহূর্ত সহ্যের অতীত যন্ত্রণায় চিৎকার করতে হয়। এরকম বহু লোককে আমি নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখেছি। মারা যাবার কথা বলছি না, নিঃশেষ হয়ে যাবার কথা বলছি। এ-সব দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে, অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে এমন লোককে মৃত্যুর অধিকার দেয়া উচিত। যাদেরকে দেখেছি, একটা করে ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হলে, তারা খুশি হত, আরাম পেত, তাদের পরম উপকার করা হত। এদের মধ্যে আমার আম্মাও ছিলো।'

ডাক্তার ওয়ার্নিক কথা বলছেন না।

'হ্যাঁ, জানি—জীবনকে শেষ করে দেয়া হলে, সেটাকে আমরা খুন বলি। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর থেকে আমার একটা মাছি পর্যন্ত মারতে হাত ওঠে না। কিন্তু...'

হাসিটা চেপে রাখা সম্ভব হলো না। এ আমার অত্যন্ত তিক্ত হাসি, উৎস আত্মধিক্কার। 'এখুনি আমরা মাংস খেলাম, তাই না? খেতে খুবই ভাল লাগল।

www.BanglaBook.org

কিন্তু এই সুস্বাদু বস্তুটি আমাদের প্লেটে পরিবেশন করার জন্যে একটা পশুকে তো মারতেই হয়েছে, তাই না? সবই আমরা জানি, জেনেই সায় দিয়েছি এই হত্যাকাণ্ডে। এরচেয়ে স্ববিরোধী ব্যাপার আর কি হতে পারে? যুক্তিবাদের এখানে চরম ব্যর্থতা। শান্তির সময় কি করি আমরা? প্রিয় কুকুরের কঠিন রোগ হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিস্তলের একটা গুলি খরচ করতে ইতস্তত করি না। রেসের ঘোড়া পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে ফেলল, তাকেও মেরে ফেলার নিয়ম করা আছে। কিন্তু যে-ই মানুষের ওরকম কিছু হলো, অমনি সবাই হাত টেনে নিলাম। কি কারণ? আমরা মানুষরা কি চিরকাল বেঁচে থাকছি? মানুষ কি পরমায়ুর অধিকারী? যুদ্ধে গিয়ে শুধু মরছি না, মারছিও লাখে লাখে। ওই সব যুদ্ধ মানুষের কোন কাজে লাগবে না।'

তবু কিছু বলছেন না ওয়ার্নিক।

আলোটাকে ঘিরে বড়সড় একটা পোকা চক্কর দিচ্ছে। বালবের গায়ে ধাক্কা খেলো একবার, ছিটকে পড়ল মেঝেতে। মরেই গেল কিনা! কিন্তু না, ওই তো নড়ছে। একটু পর চলতে শুরু করল। তারপর উড়তে। উড়ে সেই আলোটার দিকেই গেল। আবার ওটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

পোকাটা অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখেনি।

ওয়ার্নিক কিছু বলছেন না, তাই আমিও চুপ করে আছি। বসে বসে পোকাটার কাণ্ড দেখছি। হঠাৎ মনে হলো, ডাক্তার হয়তো আমাকে বলবার সুযোগ দেয়ার জন্যেই চুপ করে আছেন। কাজেই আবার আমি শুরু করলাম, 'পাদ্রী বোডেনডিক তো গির্জার প্রতিনিধি। এখন যদি এখানে উনি থাকতেন, এক কথায় সবগুলো সমস্যার সমাধান করে দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। ইতর প্রাণীর আত্মা নেই, মানুষের আছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, আত্মা কি? উন্মাদের শরীরে এক টুকরো আত্মার কি-ই বা কাজ, কি-ই বা উপযোগিতা? কিংবা যে লোক নির্বোধ, জড়পদার্থ বললেই হয়, তার শরীরে? আশ্রমের সংরক্ষিত ওয়ার্ডে আমি গেছি, ডাক্তার। সবগুলোয় নয়, কয়েকটায়। ওই ওয়ার্ডগুলোয় যারা থাকে, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে ইতর প্রাণীকেও ফেরেশতা বলতে হবে। আমাকে বলতে পারেন, ওই লোকগুলোর শরীরের ভেতর কতটুকু আত্মা আছে? ভেতরেই আছে কি? না অদৃশ্য একটা বেলুনের মত মগজহীন খুলির ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে?'

কথা বললেন না, তবে এবার ডাক্তার একবার মাত্র হাত নেড়ে সাড়া দিলেন। ঠিক সাড়া দিলেন কিনা বলা মুশকিল, শার্টের আস্তিনে একটা পোকা চরতে দেখে হাতের টোকায় ফেলে দিলেন আর কি।

কাজেই আমার কথা আবার আমি শুরু করলাম। 'এত সব প্রশ্নের জবাব দেয়া পাদ্রী বোডেনডিকের জন্যে পানির মত সহজ। রহস্যময় এক ঈশ্বর আছেন। আছে স্বর্গ, আছে নরক। দুনিয়াতে এসে দুঃখ পাচ্ছ, স্বর্গে তোমার জন্যে সুখ বরাদ্দ করা আছে। দুনিয়াতে এসে পাপ করলে মারা যাবার পর কপালে খারাবি আছে। এসব উত্তর কি যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়? যা বলা হবে তাই তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। সত্যি না মিথ্যে তা কেউ কখনও জানতে চায় না। পাদ্রী বোডেনডিক সহাস্যে বলবেন, বিশ্বাস করলে সব মেলে, তর্ক করলে ধাঁধা সৃষ্টি

www.BanglaBook.org

হয়। কিন্তু আমার কথা হলো, বিশ্বাস নিয়েই যদি খুশি থাকব, আমাকে তাহলে বিচারবুদ্ধি দেয়া হয়েছে কেন? আমি যে সমালোচনা করতে জানি, এই শক্তিই বা তাহলে কেন দেয়া হলো? প্রশ্ন করতে পারব, কিন্তু উত্তর পাব না, এটাই কি ঈশ্বরের শেষ কথা?'

এবার নড়েচড়ে বসলেন ডাক্তার ওয়ার্নিক। 'ঈশ্বরের শেষ কথা যে কোনটা তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন,' বললেন তিনি। 'কিংবা বোডেনডিকও হয়তো জানেন। তোমার কথা শেষ হয়ে থাকলে আপাতত আমি রেহাই পেতাম।'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি,' বললাম আমি। 'তবে আপনাকে আর বিরক্ত করবারও ইচ্ছে নেই।'

'আমাকে বিরক্ত করে লাভও নেই। ইতিমধ্যে তোমার তো বুঝে নেয়ার কথা যে এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'উত্তর দেয়া সম্ভব হলে সেটাই হত আশ্চর্যের বিষয়। দুনিয়ায় হাজার হাজার লাইব্রেরী আছে। সে-সব লাইব্রেরীতে আছে লাখ লাখ, কোটি কোটি বই, তার কোনটাতেই উত্তর লেখা নেই। লেখা আছে শুধু জল্পনা।'

গ্লাসে মোজেল ঢালছেন ডাক্তার, চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'যুদ্ধক্ষেত্রে কতদিন ছিলে তুমি?'

'তিন বছর।'

'তিন বছর দীর্ঘ একটা সময়।'

আমি কিছু বললাম না।

ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বিচার বুদ্ধিকে আত্মার অংশ বলে মনে করো?'

'এ-সব আমার জানা নেই,' বললাম। 'কিন্তু আপনার কি ধারণা, সংরক্ষিত ওয়ার্ডগুলোয় অধঃপতিত যে জীবগুলো হামা দিচ্ছে, নিজেদের মলমূত্রে নোংরা করছে নিজেদের, এখনও তাদের শরীরে আত্মা আছে?'

গ্লাসটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে ডাক্তার বললেন, 'এ-প্রশ্ন আমার কাছে জটিল নয়। আমি একজন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী হিসেবে আমার কাজ পর্যবেক্ষণ করা, বিশ্বাস করা নয়। কিন্তু পাদ্রী বোডেনডিকের কাজই হলো বিশ্বাস করা, যুক্তি-প্রমাণের তোয়াক্কা না করেই বিশ্বাস করা। বিজ্ঞানী আর পাদ্রীর মাঝখানে তুমি হতভাগা ওই নাছোড়বান্দা পোকাটার মত ফর ফর করে উড়ে বেড়াচ্ছ।'

পোকাটা বারবার পড়ছে আর উঠছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যতক্ষণ না মরছে ততক্ষণ এভাবেই চালিয়ে যাবে সে।

হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলেন ডাক্তার। 'এবার হয়তো হতভাগা পোকাটা বাঁচবে।'

খোলা জানালা গলে ঘরের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাত। সর্বগ্রাসী নিবিড় নীল তার রঙ। রাত এল মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ আর তারার মালা থেকে আলোর আভা নিয়ে। এই যে আশ্চর্য একটা পরিবেশ তৈরি হলো, তার ফলে কি ঘটল? এতক্ষণ ধরে যা বললাম, এখন মনে হচ্ছে সবই অর্থহীন প্রলাপ। নিজেই বুঝতে পারছি, প্রশ্নগুলো তুলে চরম বোকামির পরিচয় দিয়েছি। বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্ধকারেই এক চক্কর ঘুরল পোকাটা। তারপর, শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম, জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'জেনেভিব টারোভান কেমন আছেন, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ওর কোন উন্নতি দেখতে পাচ্ছেন?'

'নাহ্, কই! ওর মা এসেছিলেন, কিন্তু চিনতে পারেনি।'

'চিনেছে হয়তো ঠিকই, ভান করেছে চেনে না।'

'অসম্ভব নয়। তবে কথা সেই একই। চিনতে পারেনি বা চায়নি। ওর মা যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ "চলে যাও! চলে যাও!" বলে চেঁচিয়েছে শুধু। অসুখটা সত্যি আজব।'

'কি রকম আজব?'

'সেটা ব্যাখ্যা করতে হলে লম্বা একটা লেকচার দিতে হয়,' বললেন ডাক্তার। 'নিজের কাছ থেকে পালানো, মনটাকে দমিয়ে রাখার অশুভ পরিণাম, মায়ের ওপর প্রবল ক্রোধ ইত্যাদি বিষয়ে।'

'লম্বা লেকচার শোনার ধৈর্য হবে না,' বললাম আমি। 'সংক্ষেপে যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন, শুনতে চাই।'

'সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, রোগী নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে অন্যের ব্যক্তিত্বকে আপন করে নেয়। অন্যের মানে, একজনের হতে পারে, আবার বহুজনেরও হতে পারে। অন্যের ব্যক্তিত্ব চর্চা করলেও, মাঝে মধ্যে আবার নিজের ব্যক্তিত্বেও ফিরে আসে অল্পক্ষণের জন্যে। জেনেভিবের সমস্যা হলো, নিজের ব্যক্তিত্বে সে একবারও ফিরছে না। শেষ ফিরেছিল অনেক দিন আগে। এর মানে বুঝতে পারছ তো? মেয়েটিকে মেয়েটির ব্যক্তিত্বে একবারও দেখোনি তুমি। যখন দেখবে, এখনকার একে তুমি হয়তো চিনতেই পারবে না।'

'কিন্তু তার যে রূপটা আমি দেখছি তা তো আমার চোখে অস্বাভাবিক লাগেনি।'

ডাক্তার আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'যুক্তিসিদ্ধ ভাবকে আমরা স্বভাব বলতে পারি তো?'

আমি হাত নেড়ে মানা করি তাঁকে, এ-সব নিয়ে আর তর্ক করতে চাই না। সহজ ভাষায় জানতে চাই, 'ওর রোগটা কি খুব কঠিন?'

'হ্যাঁ, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কঠিনই বলতে হবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগটা সেরে যায়। সারেও একেবারে হঠাৎ, সবাইকে অবাক করে দিয়ে।'

'কিন্তু রোগটা সারলে ওর কি উপকার হবে বলতে পারেন? এখন যেভাবে আছে, ওকে তো আমার অসুখী বলে মনে হয় না।'

'ও অসুখী নয়, অসুখী ওর মা। মা-ই তো মেয়ের চিকিৎসা করাচ্ছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে আমি বলব...না, আমার কথা থাক। অপারেশন করলে রোগী মারা যাবে জানার পরও অনেক সময় আমরা অপারেশন করতে বাধ্য হই।'

আমি কথা না বলে চিন্তা করছি।

ডাক্তার টেবিল ছেড়ে উঠলেন। 'সংরক্ষিত ওয়ার্ড দেখতে যাব। যাবে নাকি আমার সঙ্গে?'

ঝোঁকটা হঠাৎই চাপল। 'যাব! যাব!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সেক্ষেত্রে সাদা একটা অ্যাপ্রন পরতে হবে তোমাকে। ওখানে যা ঘটছে, দেখে বমি করে ফেলতে পারো। বমি যদি না করো, ফেরার পর মোজেল দ্বিগুণ মজা লাগবে।'

'ছাই মজা লাগবে, বোতল তো খালি!'

'আছে, বোতল আরও আছে। লাগবেও সেটা। তোমার বয়স মাত্র পঁচিশ হলে কি হবে, গাদা গাদা মানুষকে মরতে দেখেছ। কিন্তু তা দেখা সত্ত্বেও, সত্যিকার শিক্ষা যাকে বলে, সেটা তোমার আজও হয়নি। শেখার মধ্যে শিখেছ বোকার মত ফালতু প্রশ্ন তুলতে। তবে সেজন্যে লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। তোমার বেলায় নতুন কিছু ঘটেনি, এটাই সম্ভবত দুনিয়ার রেওয়াজ। প্রকৃত শিক্ষা জিনিসটা সহজে কেউ পায় না। যদি কেউ পায়ও, এত দেরিতে পায় যে তখন আর কাজে লাগাবার মত সুযোগ ও শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। দেখে শিখবে, এরকম ভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। আবার ঠেকেও সবাই শেখে না। চলো তাহলে, যাই...'

সেই রাতেরই ঘটনা। কাফে সেন্টারে আমরা তিনজন বসে আছি—আমি, জর্জ আর উইলি। আজ একা হতে কেমন যেন ভয় ভয় করছে আমার। ডাক্তার ওয়ার্নিকের সঙ্গে গিয়ে কি সব দেখে এলাম! সংরক্ষিত ওয়ার্ডটায় ভিড় করে আছে শুধু অঙ্গহীন আহতরা। বেঁচে থেকেও মরে গেছে তারা। যুদ্ধের বলি। না, ডাক্তার ওয়ার্নিকও জানেন না কেন এদেরকে পাগলাগারদে তুলে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

ওই ওয়ার্ডে এমন সব মানুষ দেখলাম যাদের মাথার অর্ধেকটাই নেই। এমন মানুষ দেখলাম যাদের শরীরের অর্ধেকটা টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেছে। ট্রেঞ্চ ধসের ফলে মাটির নিচে যারা চাপা পড়েছিল, এত বছর পর এখনও তারা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া শ্বাস নিতে পারে না।

দুনিয়ার প্রায় সবাই বিগত মহাযুদ্ধের কথা ভুলে গেছে। কিন্তু এই ওয়ার্ডের কয়েকটা ঘরে সেই যুদ্ধ যেন এখনও প্রচণ্ডভাবে চলছে। এদের কানে এখনও গ্রেনেড ফাটছে। চোখ খোলা রাখুক বা বন্ধ রাখুক, এখনও এরা বীভৎস হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করছে। এদের পেটে বিঁধছে বেয়নেট। আহত সৈন্যরা সরে যেতে পারছে না, তাদেরকে চিড়ে-চ্যাপ্টা করে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ট্যাঙ্ক বহর। চারদিক থেকে বোমা পড়ছে, গুলি হচ্ছে—মানুষ চিৎকার করছে, মানুষ আহত হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে সব, জ্যান্ত মানুষ তার নিচে চাপা পড়ছে। এ-সবই অতীতের ঘোর দুঃস্বপ্ন, কিন্তু যেন কোন নিষ্ঠুর জাদুবলে এই ওয়ার্ডে চিরস্থায়ী বাস্তব হয়ে আছে। চারদিকে প্রকৃতি যখন বসন্তের সাজে সাজছে, ঘরে ও বনে আনন্দের ধুম লেগেছে, ধরণীর পুলক-শিহরণ ফুটে বেরোবার পথ করে নিচ্ছে ফুলে ফুলে, তখনও যুগ-প্রাচীন ও বিস্মৃতপ্রায় সেই বিভীষিকার জের চলছে এই ওয়ার্ডে। বিছানা এখানে বিছানা নয়, ট্রেঞ্চ বা আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেল। ধ্বংসস্তূপের নিচে বারবার চাপা পড়ছে, বারবার উঠে আসছে মাটির তলা থেকে। কেউ মরছে, কেউ মারছে। কারও দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেউ গলা টিপে ধরছে। ঘরে ঘরে এখানে বিষ নিঃশ্বাস পড়ছে। চারদিকে চিৎকার, আর্তনাদ, গোঙানি আর সর্বগ্রাসী

www.BanglaBook.org

আতঙ্ক। এমন লোকও দেখলাম যারা চিৎকার করতে পারছে না, নড়তে পারছে না, শরীরটাকে যতটা সম্ভব ছোট করে এক কোণে লুকিয়ে রেখেছে নিজেদের, পারলে দেয়ালের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় মুখ, সারাক্ষণ থরথর করে কাঁপছে ভয়ে।

অকস্মাৎ একটা চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম।

'দাঁড়াও সবাই!'

চিন্তার জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, খেয়ালই ছিল না তিনজন এক টেবিলে বসে আছি। হঠাৎ পিছন থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো কর্কশ গলা চিৎকার করে উঠল, 'উঠে দাঁড়াও!' গলার আওয়াজ কর্কশ হলেও, পরিণত বা ভরাট নয়। কি ব্যাপার? আশপাশের কয়েকটা টেবিল থেকে অনেকেই লাফ দিয়ে সিধে হলো। ইতিমধ্যে অর্কেস্ট্রায় বাজতে শুরু করেছে—'পিতৃভূমি! মাতৃভূমি! সবার ওপরে তুমি দেবভূমি পিতৃভূমি!'

এবার নিয়ে আজ রাতে চারবার এই কাণ্ড ঘটছে। এদের দেশপ্রেম কী প্রচণ্ড!

দেশপ্রেম প্রচণ্ড তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দেশপ্রেম হোটেলঅলার নয়, নয় বাজনদারদেরও। একদল বদমাশ ছোকরা দেশপ্রেমের ঠিকাদারি নিয়েছে যেন। এরা নিজেদের কেউকেটা বলে জাহির করার জন্যে লাঠি ঘোরাচ্ছে। সব হোটেল-রেস্তোরাঁতেই আছে ওরা। কিছুক্ষণ পরপর তাদের একজন বাজনদারদের হুকুম করছে, 'জাতীয় সঙ্গীত বাজাও!' তখন যে কি তার মেজাজ! ছোকরা যেন এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে যুদ্ধে। সন্ত্রস্ত বাজনদাররা তার হুকুম অগ্রাহ্য করতে পারে না। যে বাজনাটা বাজাচ্ছিল সেটা বন্ধ করে বাজাতে লাগল জাতীয় সঙ্গীত। আর যেই না জাতীয় সঙ্গীত শুরু হলো, অমনি ছোকরা দেশপ্রেমিকদের কচি গলা থেকে বেরিয়ে এল কঠিন নির্দেশ, 'উঠে দাঁড়াও!' দেশজুড়ে এটা প্রচলিত প্রথাও বটে। জাতীয় সঙ্গীত বাজলে সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হবে। জাতীয় সঙ্গীতকে প্রাপ্য সম্মানটা তো দিতেই হবে। কাজেই বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়ায় সবাই।

ওদের একজন, ছোকরার বয়েস হবে খুব বেশি হলে সতেরো, আমার কানের কাছে এসে চেঁচামেচি করছে। যুদ্ধের সময় ওর বয়েস ছিল টেনে-টুনে বারো। আমি উঠছি না দেখে হুমকি দিয়ে বলছে, 'দাঁড়াও! উঠে দাঁড়াও!'

'এমন চড় মারব না!' রাগে ধমক দিলাম। 'ভাল চাস তো স্কুলে ফিরে গিয়ে পড়াশোনা কর, যা!'

'বলশিভিস্ট!' ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল। শব্দটার অর্থ নিশ্চয়ই তার জানা নেই। 'সাথীরা! এখানে একদল বলশিভিস্ট গোঁয়ার্তুমি করছে!'

একটাই উদ্দেশ্য এদের, যে-কোন অজুহাতে মারামারি বাধানো। জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে ওরা। মানুষের বিরক্ত হওয়াটা স্বাভাবিক। খেতে বসেছে, হঠাৎ তাকে দাঁড়াতে বললে কেমন লাগে? শোকাকুল একজন লোককে তার বন্ধু-বান্ধব সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত, এই সময় অকস্মাৎ একদল ছোকরা এসে বলল, দাঁড়াও! স্বভাবতই প্রতিবাদ করছে মানুষ, বলছে এত ঘন ঘন যেখানে সেখানে উঠে দাঁড়াতে রাজি নয় তারা। এ কথা শুনে রগচটা ছোকরার দল মারমুখো হয়ে ছুটে আসছে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে। এই ছোকরাগুলো সংগঠিত, দেশজুড়ে দল গঠন করেছে। দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে বহিষ্কৃত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কয়েকজন সরকারী কর্মচারী। সরকারের ওপর তাদের প্রবল আক্রোশ।

ছোকরারা একজন দু'জন করে এগিয়ে এল। আমাদের টেবিলটাকে গোল করে ঘিরে দাঁড়াল তারা। সব মিলিয়ে বারো জন তো হবেই। চিৎকার করতে লাগল তারা। 'ভালয় ভালয় উঠে দাঁড়াও, তা না হলে বিপদ হবে।'

'কি সেই বিপদ?' জানতে চাইল উইলি।

'দেখতে চাও কি বিপদ? তোমরা কাপুরুষ! তোমরা দেশদ্রোহী! ওঠো! ওঠো বলছি!'

জর্জ একদম শান্ত। সে খুব নরম, তবে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'তোমরা যাও, টেবিলের কাছে ভিড় কোরো না। এত কম বয়স তোমাদের, অথচ হুকুম করছ!'

এরপর এমন একজন উদয় হলো যাকে দুধের বাচ্চা বলা চলে না। তার বয়স ত্রিশ তো হবেই। ভিড় ঠেলে টেবিলের সামনে চলে এল সে। জানতে চাইল, 'কেমন লোক তোমরা? জাতীয় সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা করতে শেখোনি?'

'জাতীয় সঙ্গীতের নামে রাস্তায় রাস্তায় হোটেলে হোটেলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করা হলে শ্রদ্ধা কি থাকে?' জিজ্ঞেস করল জর্জ। 'তোমাদের বাঁদরামি অনেক সহ্য করা হয়েছে। এখন দয়া করে অন্য দিকে যাও, শান্তিতে খেতে দাও আমাদের।'

'আমরা বাঁদরামি করছি?' ওরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। 'জার্মান জাতির সবচেয়ে প্রিয় জিনিস এই জাতীয় সঙ্গীত, সেটা তোমাদের কাছে হলো বাঁদরামি? এত বড় স্পর্ধা তোমাদের? ভীতু, কাপুরুষের দল! নিশ্চয়ই তোমরা যুদ্ধ করোনি! বলো, যুদ্ধের সময় কোথায় ছিলে তোমরা?'

'নেহাতই দুর্ভাগ্য আমাদের,' বলল জর্জ। 'যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চেই ছিলাম।'

'বললেই হলো ট্রেঞ্চে ছিলে? প্রমাণ?'

উইলিকে দেখে একটা দৈত্যই মনে হয়। চেয়ার ছেড়ে বাতাসে ঘুসি চালাল সে। 'জিজ্ঞেস করো, এই মার কোথায় শিখেছিলাম? শিখেছিলাম প্রুশিয়ায়, বুঝলে! প্রমাণ চাইছিলে, না? এটাই প্রমাণ।'

উইলি ঘুসি চালিয়েছে বাতাসে, তাতেই বয়স্ক লোকটা লাফ দিয়ে তিন ফুট পিছিয়ে গেল।

'একটু আগে তুমিই না আমাদেরকে কাপুরুষের দল বলছিলে?' হেসে উঠল উইলি। 'দেখা যাচ্ছে আমরা নই, তোমরাই কাপুরুষ!'

এই সময় হোটেলঅলা এগিয়ে এল। তার সঙ্গে তিনজন স্বাস্থ্যবান ওয়েটার। 'সবাই চুপ করুন! এটা আমার ব্যবসা, এখানে আমি গোলমাল করতে দেব না।'

বাজনদাররা ওদিকে বাজাতে শুরু করেছে, 'ওরে ও বিহঙ্গ, তোর সন্ধ্যা কাকলি...'

সুবিধে করতে না পেরে দেশপ্রেমিকের দল কাফে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, যাবার সময় হুমকি দিচ্ছে, 'ঠিক আছে, আমরাও দেখে নেব।'

জানা কথা, আমরা বাইরে বেরুলেই ওরা হামলা করবে। তার আলামতও টের পাওয়া গেল। বাইরে ওরা দলবেঁধে অপেক্ষা করছে। সব মিলিয়ে বিশ-বাইশজন তো হবেই। দাঙ্গা বাধলে বিপদেই পড়ব আমরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেবারে হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য পেলাম। রোগা একহারা, ছোটখাট একটা মানুষ এগিয়ে এল। সোজা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। একে আমরা চিনি। বোডো লেডারহোজ, পুরানো লোহা আর চামড়ার ব্যবসা করে। সে-ও যুদ্ধে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে ফ্রান্সেই ছিল।

আমরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগে সেই মুখ খুলল। 'বাবারা! সবই দেখলাম, সবই শুনলাম। জানি, সহ্যের সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু একা নই আমি। সঙ্গে আমার দল আছে। কিসের দল? ক্লাব, বাবারা, ক্লাব! সদস্যরা সবাই ওই কোণে বসে আছে। আমরা বারোজন। মারামারি যদি লাগেই, তোমাদের সঙ্গে আছি আমরা। ঠিক আছে তো? তোমরা রাজি?'

'খুব রাজি, বোডো! তোমাকে নিশ্চয়ই ঈশ্বর পাঠিয়েছেন।'

'এই কাফে ঠিক ভদ্রলোকদের জায়গা নয়। আমরা স্রেফ বিয়ার খেতে এসেছিলাম। ভদ্রলোকদের জায়গা না হলে কি হবে, বিয়ারটা এখানে খুব ভাল পাওয়া যায়। সেজন্যেই মাঝে মধ্যে এখানে আসতে হয়।'

'আমরাও এদিকে খুব কমই আসি।'

বোডো বলল, 'আমরা কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকছি না। একটু পরই উঠতে চাই। তোমরা বাবারা কি আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাও?'

'না-না, আমরাও এখুনি বেরুতে চাই।'

বিল মিটিয়ে আমরাও টেবিল ছাড়লাম। দরজায় তখনও পৌঁছাইনি, দেখতে পেলাম জাতীয় সঙ্গীতের রক্ষকরা আমাদেরকে আটক করার জন্যে এক লাইনে দাঁড়িয়ে পাঁচিল তৈরি করছে। আরে, জাদু নাকি! ওদের হাতে লাঠি এল কোথেকে? লাঠি অবশ্য সবাই যোগাড় করতে পারেনি, তাই রাস্তা থেকে যে যা পেয়েছে তাই তুলে নিয়েছে–ইঁট, পাথর, চেলা কাঠ। দরজার বাইরে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ দেখি আমাদের সামনে বোডো। আমাদের তিনজনকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল সে, নিজের এক ডজন বন্ধুকে নিয়ে দরজা টপকে বাইরে বেরুল। চিৎকার করে বলল, 'ব্যারাম হয়েছে, দাওয়াই লাগবে তোমাদের, তাই না? কি, গোমড়ামুখো ইতর বালকের দল?'

রাষ্ট্রের ঠিকাদাররা চোখে আগুন জ্বেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ভীতু!' হিসহিস করে উঠল সেই ত্রিশ বছর বয়েসী নেতা। 'কাপুরুষ!'

লোকটা আমাদেরকে ভীতু আর কাপুরুষ বলছে! অথচ সেই তো বিশজন সঙ্গী নিয়ে আমাদের তিনজনের ওপর চড়াও হতে চাইছিল!

সুবিধে করতে পারবে না, বুঝতে পেরে আক্রোশে শুধু চেঁচাচ্ছে লোকটা, 'কাপুরুষ! কাপুরুষ! দিন তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না, একদিন ঠিকই ধরব তোমাদের...'

'কে কাকে ধরবে দেখা যাবে,' বলল উইলি। 'ভুলে যেয়ো না, একটানা দু'বছর ট্রেঞ্চে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি আমরা। আরেকটা কথা, আমাদের সঙ্গে লাগতে হলে লোকসংখ্যা আরও বাড়াতে হবে তোমাদের, অন্তত চারগুণ করতে হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোকরারা পিঠ দেখিয়ে চলে গেল।

বোডোর দলকে সঙ্গে নিয়ে গ্রসস্টাস এলাকা পার হচ্ছি আমরা। সারা আকাশে তারার মেলা বসেছে। রাস্তার দু'পাশে দোকানগুলোও খোলা সব, ঝলমল করছে আলোয়। এ-সব দেখে সত্যি বিস্ময় জাগে। এরকম বিস্ময় যুদ্ধের সময়ও অনুভব করেছি। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে দলবেঁধে মাঝে মধ্যে পথে হাঁটার সুযোগ যখনই পেয়েছি, বিস্ময়কর অনেক জিনিসই চোখে পড়েছে। এক নম্বর বিস্ময় কি? এই যে আমরা বেঁচে আছি, এটাই সবচেয়ে বড় অবাক করা কাণ্ড। তারপর কি? যে যার খুশি মত যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছি, এটাই দুই নম্বর বিস্ময়।

হঠাৎ ডাক্তার ওয়ার্নিকের একটা কথা মনে পড়ে গেল। প্রায়ই তিনি কথাটা বলেন। 'আমাদের সবার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমরা যারা যুদ্ধের পরও বেঁচে আছি, তারা ভাগ্যবান।'

একদম খাঁটি কথা। না-না, প্রশ্নটা কৃতজ্ঞতার নয়। না ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন, না অন্য কারও ওপর। সন্তুষ্ট থাকা উচিত ঘটনাচক্রের ওপর। আমাদের সবাইকেই অবশ্য একদিন মরতে হবে। না মরে উপায় নেই। কিন্তু হাজারে হাজারে লাখে লাখে ওই যে পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল প্রায় অর্ধেকটা পৃথিবী জুড়ে, ওদের মত আমরাও যে মরলাম না, সেজন্যে অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকা উচিত আমাদের।

হাঁটতে হাঁটতে বোডো বলল, 'চলো, অন্য কোথাও গিয়ে বসি আমরা। ওখানে খেয়ে তৃপ্তি পাইনি। চলো, নাহয় আমার ওখানেই চলো। ওখানে কেউ বাঁদরামি করতে আসবে না।'

তাই গেলাম। বাড়িটা বেশ বড়সড়, নিচে হোটেল—কফি, বিয়ার, আইসক্রীম ইত্যাদি পাওয়া যায়। ওপরতলায় বিভিন্ন সংগঠনের অফিস। বোডোর দলও একটা ঘর ভাড়া নিয়ে ক্লাব করেছে। ক্লাব মানে গায়কদের সমিতি। এরকম আরও অনেক ক্লাব আছে শহরে, গুনে শেষ করা যাবে না। এ সময় যেন একা চলাই মুশকিল, কয়েকজনকে নিয়ে দল বাঁধতে হয়। বোডোরা প্রতি হপ্তায় মিলিত হয়। অনেক নিয়ম-কানুন, অনেক রকমের আনুষ্ঠানিকতা। ওদের ক্লাবটা তিনতলায়। প্রতি বৃহস্পতিবার বসে ওরা।

'গায়ক বেশ ক'জনই আছে আমাদের,' বলল বোডো। 'তবে একটা জিনিসের অভাব বেশ ভোগাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও চড়া গলার গায়ক যোগাড় করতে পারিনি আমরা। বলতে পারো, চড়া গলার গায়ক কোথায় পাই? মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ওরা কি সব যুদ্ধের সময় দলবেঁধে মারা গেছে? সম্ভবত এ-প্রজন্মে আর এই অভাবটা মিটবে না।'

আমি বোডোকে একটা সুখবর দিলাম। 'আমাদের উইলির গলা কিন্তু খুবই চড়া। মূল গায়েন হিসেবে ওর নামও তো খুব।'

'তাই নাকি?' লাফিয়ে উঠল বোডো।

তারপরই উইলিকে ক্লাবের সদস্য করার জন্যে শুরু হলো সাধাসাধি আর পীড়াপীড়ি। আমরা নীরব দর্শক সেজেই থাকলাম। জানি উইলিকে রাজি করা সহজ কাজ হবে না। কিন্তু উইলি আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে এক সময় বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্লাবের সদস্য হতে পারলে খুশিই হয় সে। সদস্যরা সেই মুহূর্তে ভোটাভুটির ব্যবস্থা করল। সর্বসম্মতিক্রমে ক্লাবের ট্রেজারার নির্বাচিত হলো উইলি। হাতে হাতে পাওয়া গেল উপকারের বদলে উপকার। আজ থেকে উইলিকে তো বটেই, তার সঙ্গে আমাদেরকেও বোডোর দল আপদে-বিপদে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। একই ক্লাবের সদস্য? সে তো মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও আপন।

পরদিন ঘুম থেকে জেগেই চমকে উঠতে হলো। বিপর্যয় ভেতরে-বাইরে সমান। কালকের চেয়ে একলাখ বিশ হাজার মার্ক বেশি দামে বিকাচ্ছে ডলার। এদিকে এমন তুমুল বৃষ্টি নেমেছে, ছাদের কিনারায় বসানো জল নিষ্কাশনের পাইপটা মাঝখান থেকে দু'টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। নিচের টুকরোটা বিকট শব্দ তুলে খসে পড়ল রাস্তায়। বৃষ্টির পানি জলপ্রপাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল জানালার গায়ে। জানালার কাঁচ বন্ধ ছিল বলে রক্ষা, তা না হলে নূহ-এর বন্যার মতই আরেকটা বন্যা আঘাত হানত আমাদের অফিস কামরায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, তাই বিছানা ছেড়ে উঠছে না জর্জ। হেনরিক আগেই জেগেছে। এই মাত্র অফিসে এসে ঢুকল। বহুরঙা একটা পা'জামা পরেছে সে, পায়ায় একজোড়া ক্লিপ আঁটা। সে যে সাইকেল চালায়, ক্লিপ জোড়া তারই বিজ্ঞাপন।

ছোকরার চেহারা দেখেই বুঝে নিয়েছি, আজও তিক্ত কিছু বলার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে আছে। অফিসের এটা-সেটা নাড়াচাড়া করছে, এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে। এভাবে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট করল। তারপর বলল, 'তোমাদের নিয়ে সত্যি আর পারছি না।'

আমি চুপ করেই আছি। এরকম নাটক করা ওর স্বভাব। এক সময় সবটুকুই বলবে।

'বেশ কিছুদিন থেকেই লক্ষ করছি, তোমরা আমার কাজে শুধু শুধু বাধা সৃষ্টি করছ। এর পরিণতি কিন্তু ভাল হবে না। আগেই সাবধান করে দিলাম, কোম্পানি কিন্তু ফেল মারবে।'

তারপরও কিছু বলছি না আমি। অপেক্ষায় আছি, ভূমিকা কখন শেষ হবে।

একটু পরই থলে থেকে বিড়ালটা বেরুল। হেনরিক বলল, 'উসট্রিনজেনে সেদিন যা হলো...'

'উসট্রিনজেন? খুনীটা ধরা পড়েছে কিনা জানো?' মুখ না খুলে পারলাম না।

'খুনী? তুমি আবার খুনী পেলে কোথায়? আমার জানামতে ওখানে কেউ খুন হয়নি। একজন মারা গেছে বটে, কিন্তু সে তো অ্যাক্সিডেন্টে। অ্যাক্সিডেন্টটাও হয়েছিল শতকরা একশো ভাগ তার নিজের দোষে। অথচ, আশ্চর্য, তোমরা তার বিধবা স্ত্রীকে বিনা পয়সায় একটা স্মৃতিফলক দান করে বসলে?'

হেনরিকের দিকে আর তাকালাম না, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি দেখছি।

'তারপর ধরো, মেয়রের সঙ্গে বিল নিয়ে যে কাণ্ডটা করে এলে তোমরা! এরপর আর উসট্রিনজেনে ব্যবসা করতে হত না তোমাদের! তবে নেহাতই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমাদের ভাগ্য ভাল যে হেনরিক ক্রল এখনও মরেনি। ঈশ্বরই জানেন আমি না থাকলে কি দশা হত তোমাদের। অনেক সেধে, অনেক মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে মেয়রকে নরম করে এসেছি।'

'বেশ, বেশ—ভালই করেছ,' পাজামাটা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে নিজের ঘর থেকে অফিস কামরায় ঢুকল জর্জ। 'জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে, তবু তোমার কথা শুনে বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে আসতে হলো। দয়া করে দেয়ালের দিকে একটু সরে দাঁড়াও—নিশ্চয়ই জানো যে ইনফ্লুয়েঞ্জা বড্ড ছোঁয়াচে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠে আসতে হলো এই কথা বলতে যে মেয়রকে তেল মাখাবার পিছনে সময় নষ্ট না করে এমন কিছু করো যাতে নগদ কিছু আমদানি হয়। আর মাত্র দিন সাতেকের মধ্যেই ওডেনওয়ার্ল্ড গ্র্যানিট-এর দেনা মেটাতে হবে। ব্যাংক খালি, অথচ একশো ডলারের কড়কড়ে দুটো নোট চাই। মার্কের হিসাবটাও শুনে রাখো—দুশো ডলার মানে পঁচিশ কোটি মার্ক।

'ও, আচ্ছা, ওডেনওয়ার্ল্ড! কিন্তু ওই কোম্পানির মালিক যে তোমার প্রাণের দোস্ত সে আমি খুব ভাল করেই জানি।' ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞা প্রকাশ করল হেনরিক।

'রিসেনডাল আমার বন্ধু ঠিকই, কিন্তু তাকে পেলে তো! সে প্যারিসে গেছে। কবে ফিরবে তার কোন ঠিক নেই। তাছাড়া, বিলটা আমরা পেয়েছি ব্যাংক মারফত। বিলের টাকা ব্যাংককেই মেটাতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে টাকা দিতে না পারলে কোম্পানি লাটে উঠবে। রিসেনডাল আমাদের বন্ধু, ব্যাংক সে-কথা শুনতে চাইবে না। সেজন্যেই বলছি, যেখান থেকে পারো কড়কড়ে দুশো ডলার যোগাড় করে নিয়ে এসো। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এখন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা দরকার। আগে আনো, তাহলে বুঝব যে হ্যাঁ, সত্যি তুমি বাহাদুর সেলসম্যান।'

বলামাত্র দুশো ডলার আনা যে বর্তমান বাজারে সম্ভব নয় তা হেনরিক যেমন জানে, তেমনি জর্জও জানে। আসলে হেনরিকের বেয়াড়াপনা সহ্য করতে না পেরে রেগে গেছে জর্জ। মেয়রকে সেদিন উচিত শিক্ষা দিয়ে এল সে, অথচ তারই ভাই হেনরিক ছুটল লোকটার পা চাটতে! এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? মেয়র এক পয়সারও নতুন কোন অর্ডার দিয়েছে? একটা বাজে লোককে কি কারণে তোয়াজ করা?

হেনরিকের এমনই স্বভাব, বড় ভাই ধমক দিলেও সহ্য করবে না। সে সঙ্গে সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। 'ডলার চাইলেই কি পাওয়া যায়? বিনিময়ে তোমার কিছু দেয়ার মত থাকতে হয়। পাঁচশো ডলারের মাল দেখাও, এখুনি বিক্রি করে দুশো ডলার যোগাড় করে আনছি। আমি তা পারি, হেনরিক তা পারে। কিন্তু পাঁচশো ডলারের মাল কি তোমাদের আছে?'

গলার আওয়াজ প্রতি মুহূর্তে চড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে করে হেসে উঠল সে। 'আরে, তাই তো! ও, ভাই, একদম ভুলে গিয়েছিলাম! আছে বটে, খাসা একটা মাল আছে। দুশো বলছ কেন, ওটা এই বাজারেও পাঁচশো ডলারে বিক্রি হওয়া উচিত।'

আমি ও জর্জ ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছি হেনরিকের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কোনটার কথা বলছি, এখনও তোমরা বুঝতে পারছ না?' আবার হেসে উঠল হেনরিক। 'ওই যে, কালো স্তম্ভটা! বাবার আমল থেকে রয়েছে বাগানে। কালো হলে কি হবে, কালো রূপের জৌলুসে বাগান একেবারে আলোকিত হয়ে আছে! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি ওই অবিলিস্ক-এর কথাই বলছি। পঞ্চাশ বছরেও ওটা কেনার মত লোক জোটেনি, আজ দেখি আমি কাউকে গছাতে পারি কিনা। তুমিই তো আমাকে বললে, যেখান থেকে পারো দুশো ডলার যোগাড় করে আনো! যাই দেখি, সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করা যায় কিনা।'

আট

গায়ে রেনকোট চড়িয়ে তৈরি হয়েই ছিল হেনরিক, বৃষ্টি একটু ধরে আসতেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে চলে যেতে জর্জও নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল আবার। অফিসে আরও কিছুক্ষণ থাকলাম আমি। বাইরে তেমন কোন কাজ নেই আমার।

জর্জ বলে গেল, দুশো ডলার চাই-ই। সেটা অবশ্য হেনরিককে লক্ষ্য করেই বলা। কারণ জর্জ জানে টাকা-পয়সার হিসাব তো আমিই রাখি। ব্যাংকের অবস্থা, রিসেনডালের বিল, কিছুই আমার অজানা নয়।

এবার বুঝি বৃষ্টিটা থামবে। বাইরে একবার বেরুতে হয়। এই একটু ঘুরে আসি। শুধু শুধু ঘরে বসে থাকতে ভালও তো লাগে না। খদ্দের এলে জর্জ তো আছেই। গায়ে জ্বর থাকলেও দরদাম করতে পারবে সে।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছি বৃষ্টি থামল কিনা। চোখ পড়ল অবিলিস্কটার ওপর। কী আশ্চর্য, তাই না! একটানা পঞ্চাশটা বছর সেই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওটা। আমাদের এই বাগানে ওটা আসার পরে শত শত পাথর, ফলক, তীরবিদ্ধ ঈগল, বল্লমগাঁথা সিংহমূর্তি এসেছে, আসার দু'দিন আগে বা পরে বিক্রি হয়ে গেছে, শুধু অবিলিস্কটা নিজের জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পুরানো খাতা ঘেঁটে দেখা গেছে, জিনিসটা কেনা হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগে, মাত্র ষাট মার্ক দিয়ে। হ্যাঁ, জর্জের বাবাই কিনেছিলেন। মাত্র ষাট মার্ক দিয়ে কেনা, কাজেই দান করে দিলেও কোম্পানির কোন লোকসান নেই। ডলারের সঙ্গে বিনিময় হার হিসাব করতে বসলে ষাট মার্কের কোন দামই পাওয়া যাবে না।

জিনিসটা কেন বিক্রি হয়নি? কারণ তো অবশ্যই আছে। কবরের ওপরে অবিলিস্ক বসানোর রেওয়াজ এক কালে হয়তো ছিল, কিন্তু তারপর উঠে যায়। উঠে যায়, কারণ কবরের ওপরে ওটা বসানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ঝামেলার কাজ।

প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা স্তম্ভটা, ওপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। কবরে বসাতে হলে প্রথমে কবরের পাশে অত্যন্ত মজবুত পাকা একটা গাঁথুনি করে নিতে হয়। যে-কোন কবর এমনিতেই খানিকটা বসে যায়। এরকম একটা অসম্ভব ভারী

www.BanglaBook.org

জিনিসের নিচে যদি শক্ত গাঁথুনি না থাকে, কবর তো তাহলে একেবারে পাতালে নেমে যাবে।

অবশেষে বৃষ্টি থামল। অবিলিস্ক নিয়ে ভেবে আর লাভ কি! রিসেনডালের বিল অন্য কোনভাবে মেটাতে হবে। অবিলিস্ক বিক্রি করে ওই বিল মেটাবার চিন্তা করাটা নেহাতই বোকামি। ভাবছি, অন্য কি উপায় করা যায়। সমস্যার সমাধান হয়ে যায় রিসেনডাল যদি হঠাৎ এসে পড়েন–প্যারিস থেকে বার্লিনে গেলেন না, সোজা চলে এলেন ওয়ার্ডেনব্রাকে। তাহলেই শুধু ক্রল কোম্পানির মান-সম্মান বাঁচে। তা না হলে সব যাবে–কোম্পানি অস্তিত্ব হারাবে, আমরা হারাব ইজ্জত।

বৃষ্টি থেমেছে, আমিও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। গ্রসস্ট্রাসে একটা মিছিল বেরিয়েছে। শুনতে পেলাম, এটা একটা বিক্ষোভ মিছিল। যুদ্ধাহত সৈনিকরা মিছিল বের করেছে। কি তাদের ক্ষোভ? সরকার কি তাদেরকে পেনশন দিচ্ছে না? না, পেনশন তারা ঠিকমতই পাচ্ছে। কিন্তু মার্কের এই দুর্দশার দিনে পেনশনের সেই টাকা হাস্যকর রকম কম। তাই পঙ্গু সাবেক যোদ্ধারা খেয়ে-পরে বাঁচার দাবিতে একজোট হয়েছে। সেই জোটেরই মিছিল এটা।

প্রথমেই এল একটা ঠেলাগাড়ি, তাতে একটা মাথা, মাথার সঙ্গে একটা ধড়ের উপরিভাগ। না, কোন হাত বা পা নেই। ধড়টা যার ছিল, সেই লোকটা লম্বা ছিল না বেঁটে? বলা সম্ভব নয়, এখন আর তা বলা সম্ভব নয়। মাথাটা অবশ্য ঠিকই আছে। প্রায় গোল সেটা। অদ্ভুতই বলতে হবে যে বাদামী চোখ জোড়া এখনও প্রাণচঞ্চল। বেশ সুন্দর করে ছাঁটা একজোড়া গোঁফও দেখা যাচ্ছে। দেখাশোনা করার কেউ আছে নিশ্চয়ই, সে বেশ যত্নও নেয় লোকটার–একেবারে নিখুঁতভাবে কামানো তার দাড়ি। মাথার চুলও পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

গাড়িটা ছোট্ট। তবে ওটাকে গাড়ি না বলাই উচিত। চাকা লাগানো খুদে একটা পাটাতন, এক লোক সেটাকে টেনে আনছে। সেই লোকের আবার হাত মাত্র একটা। পাটাতনে বসে আছে মাথা সর্বস্ব লোকটা, বসেছে খাড়া হয়েই, রাস্তার চারপাশে নজর বোলাতে বোলাতে চলেছে। তার পাটাতনের পিছনে অনেকগুলো হুইল চেয়ার, প্রতি সারিতে তিনটে করে। হুইল চেয়ারে যারা বসে আছে তাদের কারও পা নেই। চেয়ারের চাকায় টায়ার লাগানো আছে, চাকাগুলো আকারে বড় হওয়ায় হাত দিয়ে ঘোরানো যায়। এমনিতে ওরা সাধারণত কোমরের নিচে এক টুকরো চামড়া বা কাপড় পরে, আজ পরেনি। ওদের পা নেই সেটা লোকজনকে দেখাতে হবে না!

মিছিলে এরপরে আছে খোঁড়ার দল। এরা বগলে ক্রাচ নিয়ে হাঁটাচলা করে। রাস্তা-ঘাটে এদের দু'একজনকে প্রায়ই দেখা যায়–একজোড়া খাড়া লাঠির মাঝখানে বাঁকাচোরা মানুষ।

এরপর অন্ধরা। তাদের সঙ্গে এক চোখ কানারাও আছে। অন্ধদের হাতে লাঠি, ফুটপাথে ঠুকে খটখট খটখট আওয়াজ তুলছে তারা, দূর থেকে যাতে শোনা যায়। শার্টের আস্তিনে চিহ্ন আছে, সেটা দেখেও তাদেরকে চেনা যায়। তিনটে বৃত্তে হলুদ একটা ডোরা।

পঙ্গুদের অনেকের বুকে বা পিঠে প্ল্যাকার্ড ঝুলছে। সে-সব প্ল্যাকার্ডে লেখা

www.BanglaBook.org

হয়েছে, 'এই কি আমাদের পিতৃভূমির কৃতজ্ঞতা বোধ?' কোনটায় লেখা, 'না খেতে পেয়ে যে মরতে বসেছি!'

সবার আগে ঠেলাগাড়ি, তাতে যে বসে আছে তার পকেটে সরু একটা বাঁশের ফালি গোঁজা, ফালিটার ডগায় উড়ছে একটা পতাকা। পতাকায় লেখা হয়েছে, 'এখন আমি প্রতি মাসে পেনশন পাই সোনার একটা মার্ক।'

আরও দুটো গাড়ি দেখা গেল, দুই গাড়ির মাঝখানে সাদা একটা কাপড় টাঙানো হয়েছে, তাতে লেখা: 'আমাদের শিশুরা দুধ খেতে পায় না, মাংস খেতে পায় না, মাখন খেতে পায় না। আমরা তাহলে কি জন্যে যুদ্ধ করেছিলাম?'

মুদ্রাস্ফীতির এই অভিশাপে সবাই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু যুদ্ধাহত এই সৈনিকদের ক্ষতির সঙ্গে আমরা যারা সুস্থ তাদের ক্ষতির কি তুলনা চলে? ওদের দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। পেনশন হিসেবে ওরা যে টাকা পায় সেই টাকার ক্রয়-ক্ষমতা এত কমে গেছে যে তা দিয়ে এখন আর কিছুই কেনা যায় না। সরকার অবশ্য মাঝে মধ্যে পেনশনের টাকা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বাড়ানো টাকা ওদের হাতে আসতে যে সময় লাগে, দেখা যায় ডলারের দাম ততদিনে আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। আগে হাজার মার্কে যা পাওয়া যাচ্ছিল এখন দশ হাজারেও তা পাওয়া সম্ভব নয়। ডলারকে খ্যাপা ঘোড়া বললেও কম বলা হয়, তার দৌড় কোথায় গিয়ে শেষ হবে কেউ তা বলতে পারে না। ডলারের দাম পরশু ছিল বারো লাখ মার্ক, কাল চোদ্দ লাখ। আগামীকাল বা পরশু কোথায় গিয়ে ঠেকবে কারও পক্ষে কি বলা সম্ভব?

শ্রমিকরা এখন দিনে দু'বার করে মজুরি পাচ্ছে। নিয়ম করা হয়েছে, মজুরি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আধ ঘণ্টার জন্যে ছুটি পাবে তারা। এই আধ ঘণ্টায় তাড়াহুড়ো করে যা খুশি কিনে ফেলুক। কাজ শেষ করে কিনতে গেলে দেখা যাবে মার্কের দাম আরও নেমে গেছে।

মিছিলের গতি খুবই মন্থর। লেজের দিকটায় তাই যানবাহনের ভিড় জমে যাচ্ছে। অনেকেই কাজে যাচ্ছে, কিংবা ফুর্তি করতে বেরিয়েছে, অচল গাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগছে না তাদের। তারা সবাই খুব বিরক্ত। একদল যুদ্ধ করে আহত হয়েছে, বিনিময়ে কিছুই পায়নি। আরেক দল যুদ্ধের সুফল ভোগ করছে। দু'দলের কোনটাতেই নেই আমরা। বোধহয় সেজন্যেই এই বৈষম্য বড় বেশি চোখে লাগে। মিছিলে সব যুদ্ধের বলি, পিছনে সব মুনাফাখোর আর সুযোগসন্ধানীর দল।

মিছিলে শীর্ণ, ক্ষুধার্ত, মলিনবদন শিশুরাও আছে। ওরা সবাই পঙ্গু, অঙ্গহীন সৈনিকদেরই বাচ্চাকাচ্চা। শিশুরা সব পিছন দিকে, তাদের সঙ্গে মিশে আছে মিছিলের কারণে আটকে পড়া বহু লোকজন। তাদের গাল ফোলা ফোলা, হাত-পা মোটা মোটা, প্রত্যেকেরই তেল চকচকে চেহারা, পরে আছে দামী লিনেন আর সিল্ক, রঙধনুর প্রতিটি রঙই ঝিলিক মারছে সেই সব পোশাক থেকে।

সবচেয়ে বেশি অসুবিধে হচ্ছে গাড়িতে বসে যারা। মিছিলকে ডিঙিয়ে সামনে এগোবার কোন পথ পাচ্ছে না তারা। পথচারীদের সুবিধে হলো, মিছিলকে এড়িয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে পারছে, মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখলে কানা-

www.BanglaBook.org

ঝোঁড়াদের দেখতে হচ্ছে না। প্রধান সড়ক থেকে ডানে-বাঁয়ে সরু অনেক গলি বেরিয়েছে, পথিকরা দলে দলে ঢুকে পড়ছে সে-সব গলিতে। জানে গন্তব্যে পৌঁছুতে অনেক বেশি পথ পেরুতে হবে, তবু।

একটা গাড়ি হর্ন বাজাচ্ছে। বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে এক সুবেশী তরুণ ফুটপাথে তুলে দিল তার গাড়ির একটা চাকা। মনে মনে সে আশা করছে, গাড়ির ড্রাইভার অস্থির হয়ে উঠেছে দেখলে মিছিলের লোকজন সরে গিয়ে জায়গা ছেড়ে দেবে, সেই সুযোগে তাড়াতাড়ি পথ করে নিয়ে বেরিয়ে যাবে সে। কিন্তু তার আশা পূরণ হলো না। মিছিলের অনেক লোকই ঘাড় ফিরিয়ে তাকে আর তার গাড়িটাকে দেখল বটে, কিন্তু জায়গা ছাড়ল না। উল্টে নিজেরা ছড়িয়ে পড়ল ফুটপাথ পর্যন্ত। কেউ কোন হুকুম দেয়নি, সাবেক সৈনিকরা নিঃশব্দে দখল করে নিল পাশের একটা রণক্ষেত্র, সেই সঙ্গে শত্রুর গতিরোধও করল।

আমি সেইন্ট মেরী গির্জা পর্যন্ত মিছিলের সঙ্গে থাকলাম। হৃদয়ের গভীরে কোথাও একটা ব্যথা টন টন করছে। ওরা যুদ্ধে ছিল, আমিও যুদ্ধে ছিলাম। এদের কাউকে আমি চিনি না, এ-কথা কি করে বলি? একই ট্রেঞ্চে এদেরই কারও সঙ্গে হয়তো কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম! প্রচণ্ড পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল যখন, হয়তো এদেরই কেউ নিজের বোতল খালি করে আমার শুকনো গলায় পানি ঢেলেছিল! এরা আমার যুদ্ধক্ষেত্রের সাথী! আজরাইলের দরজায় পরস্পরের বন্ধু ছিলাম আমরা। ওরাই তো আমার সত্যিকারের আপনজন। আজ ওরা নিঃস্ব। নিঃস্ব আমিও। কিন্তু অমিলটাও প্রচণ্ড, বড় বেদনাদায়ক আর মর্মান্তিক—আমার হাত-পা-চোখ আছে, ওদের নেই।

সেইন্ট মেরী গির্জায় পৌঁছে ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোককে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। চিনতে অসুবিধে হলো না, জাতীয় সমাজবাদী দলের সদস্য ওরা। প্ল্যাকার্ডে লেখা হয়েছে, 'ভাই সব, আমাদের দলে যোগ দাও, আমাদের সাথে হাত মেলাও, তোমাদের রক্ষা করবেন অ্যাডল্‌ফ্ হিটলার।'

মিছিল চলে গেল গির্জার আড়ালে। পিছন পিছন কয়েক সারিতে অনেকগুলো গাড়ি কাছিমের মত মন্থর গতিতে আসছিল, এবার সেগুলো ডানে-বাঁয়ে যেদিকে পারল সবেগে ছুটল।

মিছিল ভেঙে গেল, কিন্তু মনটা আমার এখনও তেতো হয়ে আছে। অফিসে ফেরার কোন তাড়াও অনুভব করছি না, কারণ জানি বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরুবে না জর্জ। উদ্দেশ্যহীন হাঁটছি, আবোলতাবোল কত কি ভাবছি। এক সময় খেয়াল হলো—এ কি! নিজেও জানি না কখন শহরতলিতে চলে এসেছি। এলাকাটার নাম বেনস্ট্রাস। এ আমার অতি পরিচিত স্থান।

ওয়ার্ডেনব্রাকের এই মহল্লাতেই কেটেছে আমার ছেলেবেলা। আমাদের সেই বাড়িটা এখন অবশ্য নেই। সেটা ভেঙে নতুন একটা কারখানার ভেতর ঢুকিয়ে নিয়েছে কারা যেন। বাড়ি না থাকুক, সেই আমলের কিছু কিছু জিনিস এখনও অক্ষত আছে। এখানে আমি মাঝে মধ্যে আসি, গত দশ বছরে অন্তত বার দশেক আসা হয়েছে। আমার ছেলেবেলার স্মৃতি ধরে রেখেছে, এমন সব জিনিসগুলো ঘুরেফিরে দেখে যাই। আমি যে স্কুলে পড়তাম সেটা এখনও আছে। আমার সঙ্গে

www.BanglaBook.org

উইলি পড়ত। আরও কত ছেলে পড়ত, এখন আর তাদের নাম মনে করতে পারি না। স্কুলটা আগের চেয়ে আরও বড় হয়েছে। সেই আমলের কয়েকজন শিক্ষক অভ্যাসটা ছাড়তে না পেরে এখনও ছাত্রদের ওপর ডাণ্ডা ঘোরাচ্ছেন। পুরানো শিক্ষকদের সঙ্গে দু'একবার দেখা করেছি আমি। কিন্তু তাঁরা যেন এড়িয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন, যুদ্ধফেরত এই সৈনিককে পাত্তা দিতে চান না। এটা কেন, আমি তা বুঝতে পারি। সাধারণ একটা ধারণা হলো, যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের সারা শরীরে শিং গজিয়েছে। সে শিং দেখা যাক বা না যাক।

স্কুল আছে, আর আছে মেয়েদের হোস্টেলটা। শুনেছি এক সময় ওটা ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের মঠ ছিল। আগে মানে কত আগে তা কেউ বলতে পারে না। আমরা তখন ছোট, খালি মঠে আশ্রয় নেয় অন্য এক শ্রেণীর অন্য আরেকদল মেয়ে। আশ্রয় নেয় মানে এখানেই তারা বসবাস করতে শুরু করে। এরা একেবারে উল্টো জাতের মেয়ে ছিল। প্রথমে ছিল সর্বস্ব ত্যাগী সন্ন্যাসিনীরা, তারপর এল ভোগিনীরা। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, নর্তকী। ওয়ার্ডেনব্রাকে একটাই অপেরা হাউস, সেখানে এরা নাচত। ডাক পেলে কাছে-দূরেও নাচতে যেত।

ওই ছোটবেলাতেই ওদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়। কি ধরনের মেয়েরা ওখানে বাস করে সেটা জানবার মত বুদ্ধি বা বয়স কোনটাই তখনও আমার হয়নি। দলবেঁধে স্কুলে যাবার পথে ওদেরকে দেখার জন্যে দু'পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতাম।

কিভাবে পরিচয় হলো সেটা বলি। একদিন একাই স্কুলে যাচ্ছি, দলের ছেলেদের পাইনি। পাব কি করে, ঘড়ি দ্রুত চলার কারণে আধ ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি যে। কিছুদূর আসার পর নিজের ভুলটা বুঝতে পারলাম। ভাবলাম, হাতে যখন অতিরিক্ত সময় আছে, আজ ওই বাড়িটার ছায়ায় একটু বসে থাকি– বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করাও হবে। ওরা এলে একসঙ্গেই যাব স্কুলে।

বসার পর মনে পড়ল, গ্রামারটা আজ ভাল করে পড়া হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে বইটা বের করে বেশ গলা ছেড়েই পড়া মুখস্থ করতে লেগে গেলাম। গর্ব না করেই বলতে পারি, অন্য রকম যত দোষই আমার থাকুক, লেখাপড়ায় কখনও আমি অমনোযোগী ছিলাম না।

দুলে দুলে আপনমনে পড়া মুখস্থ করছি, হঠাৎ মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। 'একটু ভুল হচ্ছে, বাপ! শব্দটার সঠিক উচ্চারণ হবে আসলে...'

এক-দেড় গজ লম্বা একটা জার্মান শব্দ উচ্চারণ করতে সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। মহিলাটি এমন অনায়াসে সেটা আওড়ালেন যে পুনরাবৃত্তি করতে আমার একটুও কোথাও বাধল না। সেই প্রথম ম্যাডাম ফ্রিজি-র সঙ্গে আমাদের পরিচয়। আমাদের বলার কারণ, আমরা দু'জন কথা বলছি এই সময় সেখানে উপস্থিত হলো উইলিরাও। ওদের সবার সঙ্গে আমিই ফ্রিজির পরিচয় করিয়ে দিলাম।

তারপরই তো চলে গেলাম যুদ্ধে। সারা দেশ একটা ঘোরতর বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ল, ফলে ফ্রিজিদের দুর্দশারও সীমা থাকল না। তবে যুদ্ধের পর এতদিনে আবার তারা সামলে নিয়েছে। এখন তো অন্য যে-কোন ব্যবসার চেয়ে তাদের নাচ দেখানোর ব্যবসা অনেক ভাল চলছে। প্রায়ই বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ পায়

www.BanglaBook.org

তারা। বিদেশে অনুষ্ঠান করতে গেলে পারিশ্রমিক পায় ডলারে। অর্থাৎ মার্কের এই মারাত্মক অধঃপতনেও তাদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। বিদেশ থেকে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসে ব্যাগ ভর্তি ডলার। তাদের সৌভাগ্য রীতিমত ঈর্ষা করার মত।

বেনস্ট্রাসে যখন এসেই পড়েছি, ফ্রিজির সঙ্গে দেখা না করে ফিরব না। কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখি ওরা সবাই শোকে কাতর হয়ে আছে। কি ব্যাপার?

ফ্রিজিদের দলের সবচেয়ে সেরা নর্তকী গতকাল মারা গেছেন। মাত্র দু'দিন আগে বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন তিনি। অসুখ নিয়েই ফেরেন। তারপর রাতে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। সবাই একেবারে পাথর হয়ে গেছে। কারও ধারণাই ছিল না যে ওঁর হার্টের রোগ থাকতে পারে। বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয়নি, স্বাস্থ্যও ছিল সুন্দর। তাঁর শারীরিক কাঠামো এত মজবুত ছিল যে বান্ধবীরা ওঁর নাম দিয়েছিল আয়রন হর্স। সবাই ওকে এই নামেই ডাকত বলে ওঁর আসল নাম যে মিলড্রেড স্যাঙ্কে, অনেকেই তা ভুলে গিয়েছিল।

আয়রন হর্স মারা যাওয়ায় শোক প্রকাশ করলাম, আন্তরিক সমবেদনা জানালাম। ব্যবসা করার কথাটা আপনা থেকেই চলে এল মনে। মারা যখন গেছেন, কবর তো দিতে হবে। ইতিমধ্যে পাদ্রী একবার এসেছিলেন, খানিক পর আবার আসবেন। লোকজন কফিনে ভরে লাশ নিয়ে চলে গেছে। শোকযাত্রা হবে, এই হোস্টেলের মেয়েরাই তাতে অংশ নেবে। আয়রন হর্সের আপনজন কেউ নেই। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, ফ্রিজিরা কেউ গত পনেরো বছরেও ওঁর কোন আপনজনকে আসতে দেখেনি। ওর চিঠিপত্র ঘেঁটে দেখা হয়েছে, সেখানেও আত্মীয়স্বজনের কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

মানুষ মারা যাবার সঙ্গেই আমাদের ব্যবসার সম্পর্ক। অনেকে বলে মৃত্যুই একমাত্র সত্য, বাকি সব মিথ্যে। একমাত্র সত্য হোক বা না হোক, আমরা কারও মৃত্যু কামনা করি না। মৃত্যু তার সময়মত আসুক, বরং ভাল হয় একটু দেরি করে হলে, কিন্তু কোনক্রমেই যেন সময়ের আগে চলে না আসে, অসহায় মানুষ আমরা সবাই এটাই চাই। এটা চাই বলেই অকালমৃত্যু আর যুদ্ধ আমাদের কাছে ঘৃণ্য একটা ব্যাপার। আয়রন হর্স সময়ের আগে মারা গেছেন, সেজন্যে তাঁর বান্ধবীদের মত আমিও দুঃখ পেয়েছি। মারা যাবার পর এখন তাঁকে কবর দেয়া হবে, তাঁর কবরে হয়তো একটা পাথর বসানো হবে। পাথর বসানোর দায়িত্বটা যদি ক্রল কোম্পানি পায়, কিছু লাভ তো হবেই। প্রশ্ন হলো, বান্ধবীরা তাঁর কবরে একটা স্মৃতিফলকও কি বসাবে না? নগদ পাওয়া গেলে, দশ-বিশ হাজার কাগুজে মার্ক যা-ই পাই, সেটাই লাভ। আশা করা যায় স্মৃতিফলকের দাম নগদেই মেটাবে এরা। বাকি রাখলে একটা দায়িত্ব মাথায় নিতে হয়, ভবিষ্যতে শোধ করতে হবে। ফ্রিজিরা কেন সে দায়িত্ব নিতে যাবেন?

আমাদের পরিচিত এক দালালের নাম অস্কার। কোথাও কেউ মারা গেলে সহানুভূতি জানাবার ছলে শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সে, সান্ত্বনাসূচক দু'একটা কথা বলার পরই চোখ ভর্তি পানি এনে ফেলে। সে পানি দু'এক ফোঁটা নয়, চোখ থেকে অবিরত ধারায় গড়াতে থাকে, গাল বেয়ে নেমে এসে বুকের শার্ট

www.BanglaBook.org

ভিজিয়ে দেয়। যতক্ষণ না একটা স্মৃতিফলক বিক্রি করতে পারছে ততক্ষণ অশ্রুর এই ধারা থামবে না। এই কাঁদতে পারার গুণে অন্য দালালদের চেয়ে অনেক বেশি অর্ডার পায় সে। সেজন্যে আর সব দালালদের তার ওপর খুব রাগ। সেই রাগের কারণেই তারা তার নাম দিয়েছে কাঁদুনে অস্কার।

আমি অস্কারের মত কাঁদতে পারি না। তাছাড়া, আমি দালালও নই। নিজের দোকানে বসে স্বেচ্ছায় আসা খদ্দেরকে যদি কিছু বেচতে পারি, সেটাকে নিশ্চয়ই দালালি বলা চলে না। হোস্টেলের নর্তকীরা আমাকে দালাল বলে ধরেও নেয়নি। বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই এক সময় প্রসঙ্গটা তুলল তারা।

'তুমি আসায় ভালই হলো, লাডউইগ। তুমি তো ফলকের দোকানে চাকরি করো, তাই না? আমাদেরকে ভাল দেখে একটা স্তম্ভ দাও না, ভাই!'

'ঠিক কি চাইছ? স্তম্ভ, না এক টুকরো পাথর? নাকি ফলক?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, মনে মনে খুশি। 'সত্যিকার একটা স্তম্ভ কিনতে হলে এখনকার বাজারে অনেক বেশি দাম পড়বে।'

'বেশি দামের হলেও অসুবিধে নেই,' বলল ওরা। 'আয়রন হর্স প্রচুর ডলার রেখে গেছে। আমরা বড়সড় আয়োজন করে কবর দেব তাকে। তুমি ভাই এমন একটা স্তম্ভ বসিয়ে দাও কবরটায়, সারা দেশের লোক যেন তা দেখার জন্যে ছুটে আসে।'

আগেই বলেছি, আমি দালাল নই। এক ফোঁটা চোখের পানি বার করার চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশি সহজ শরীর থেকে খানিকটা রক্ত বের করে দেয়া। চোখের পানি ফেলার অবশ্য কোন প্রয়োজনই হলো না, মামুলি দু'একটা সহানুভূতিসূচক বাক্য ব্যয় করে সেদিন আমি ওই হোস্টেল থেকে নগদ আড়াইশো ডলার নিয়ে এলাম।

জানতে চাইছেন, কিভাবে? কিসের বিনিময়ে?

পঞ্চাশ বছরেও যেটা বিক্রি হয়নি, যেটা বিক্রি করা অসম্ভব বলে ঘোষণা করেছে হেনরিক আজ সকালে, আমি সেই কালো পাথরের অবিলিস্কটাই আড়াইশো ডলারে বেচে দিয়েছি। আড়াইশো ডলার! গাড়ি ভর্তি মার্ক নয়, কড়কড়ে ডলার। সোনার চেয়েও দামী।

অবশ্য দু'চার ডলার খরচ আছে ওটার পিছনে। যুগের পর যুগ পড়ে থাকায় ছয় ইঞ্চি পুরু শ্যাওলা জমেছে ওটার গায়ে। সাফসুতরো করার পর পালিশ দিতে হবে।

নয়

পরদিন সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার পর ডাক্তার ওয়াগনিকের সঙ্গে বসে গল্প করছি। খাওয়ার টেবিলটায় আজকাল আমরা দু'জনই শুধু হাজির থাকি। পাদ্রী বোডেনডিক এখানকার গির্জার প্রার্থনা সেরেই অন্য এক গির্জার উদ্দেশে ছোটেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার কী একটা কাজ!' আজকাল এই কথাটা তাঁর মুখে লেগেই আছে।

খাবার ঘরে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম আজ। সাধারণত তিনটে চেয়ার থাকে, আজ দেখছি চারটে। সবগুলো চেয়ারই নতুন, পুরানোগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সাদা একটা টেবিল-ক্লথও বিছানো হয়েছে। ফুলদানিতে টাটকা ফুলও দেখতে পাচ্ছি। ব্যাপার কি?

অপেক্ষা করছি। এক সময় ডাক্তার ওয়ার্নিক হাজির হলেন। কোন ভূমিকা না করে সরাসরিই বললেন তিনি, 'তুমি না সেদিন জেনেভিব টারোভানের কথা জানতে চাইছিলে?'

'হ্যাঁ, চাইছিলাম। প্রথমে আপনিই আমাকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, আমি যেন ওর সঙ্গে এক-আধটু মেলামেশা করি। তো মেলামেশা করতে গিয়ে একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েছি আর কি।'

'না-না, তোমাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। শোনো, জেনেভিব টারোভান একেবারে হঠাৎ...এ-ধরনের কিছু যে একটা ঘটতে পারে, তোমাকে বোধহয় তা বলেওছিলাম আমি...'

'একেবারে হঠাৎ?' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লাম আমি। উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপ ধরে গেছে শরীরে।

'কি হলো? লাফিয়ে উঠলে কেন?'

'কই, এ-কথা তো আপনি একবারও বলেননি যে মেয়েটি হঠাৎ মারা যেতে পারে!' আবেগে এমন বুজে এল গলা যে আওয়াজটা আমার বলে চিনতেই পারলাম না।

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন ডাক্তার। ধপ করে এত জোরে বসলেন চেয়ারটায়, ওটা ভেঙে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

'ডাক্তার! আপনার একজন রোগিণী মারা গেল, অথচ আপনি হাসছেন?'

'আমি বলেছি সে মারা গেছে?' বিষম খেলেন ডাক্তার ওয়ার্নিক, হাসিটা থামাতে পারছেন না।

আচ্ছা, তাহলে মারা যায়নি! উফ্, কী সাংঘাতিক একটা ধাক্কা খেয়েছি! উত্তেজনাটা ধীরে ধীরে কমে এল। এরকম অস্থিরতা দেখানোটা যে ছেলেমানুষি হয়ে গেছে, তাতে আর সন্দেহ কি! আমি আর কিছু বলছি না। যা বলবার ডাক্তার নিজেই বলবেন এখন।

'কি, তোমার কৌতূহল কি উবে গেল?' বিষম খেয়ে একটানা বেশ কিছুক্ষণ কাশলেন ডাক্তার, তারপর জিজ্ঞেস করলেন।

'কেন, জানেন না, আমি স্মৃতিফলকের সেলসম্যান? এই কালই তো একটা অবিলিস্ক বিক্রি করলাম নগদ আড়াইশো ডলারে। যে মারাই যাক, তার সম্পর্কে আমার কৌতূহল না হবারই তো কথা।'

'কি বললে? আড়াইশো ডলার? ড-লা-র? কি বলছ? আড়াইশো ডলার এদেশে এখনও আছে নাকি? চামড়ার চোখে কেউ দেখেছে?'

কথা না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাগিচাটা এখান থেকে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। বেঞ্চটাও চিনতে পারলাম, যে বেঞ্চে সেদিন বিকেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি আর ইসাবেল পাশাপাশি বসেছিলাম।

ইসাবেল ব্যাকুল হয়ে আমাকে বলেছিল, 'আমার বড় ভয় করে, রুডল্‌ফ্! প্লীজ, আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না!'

ডাক্তার কি বলবেন কে জানে। হঠাৎ ইসাবেলের কি হলো? খারাপ কিছু হলে কি এরকম হাসতে পারতেন ভদ্রলোক? কি জানি, বলাও যায় না। সাধারণ লোকের বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ডাক্তারের বিচার-বুদ্ধি মেলে না। আমরা যেটাকে খারাপ বলে রায় দেব, উনি হয়তো সেটার মধ্যেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের তাৎপর্যপূর্ণ কোন ভাল জিনিস আবিষ্কার করে বসবেন।

আনমনে তখনও বাগিচার দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ ডাক্তারের কথায় মনোযোগী হয়ে উঠলাম। 'সেরে গেছে, হে! একেবারে হঠাৎ করেই সেরে গেছে!'

'কি বলছেন আপনি, ডাক্তার!' আবার আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। 'সেরে গেছে? সত্যি সেরে গেছে? এরচেয়ে ভাল খবর আর কি হতে পারে! কিন্তু ...আপনি ঠাট্টা করছেন না তো আবার?' ডাক্তারের দিকে খানিকটা ঝুঁকলাম। 'পাগলামি কি কখনও চিকিৎসায় সারে?'

'সিজোফ্রেনিয়া সারে বৈকি,' বললেন ডাক্তার। 'সাধারণ পাগলামির সঙ্গে এটার পার্থক্য আছে। তাহলে তোমাকে সব কথা খুলেই বলতে হয়। জেনেভিবের মাকে তুমি তো দেখোনি। তিনি কিন্তু বৃদ্ধা নন। বয়সের দিক থেকে অনায়াসে তাঁর আরেকবার বিয়ে করা চলে। এতে তাঁর মনের সায়ও ছিল। এক ভদ্রলোককে তিনি পছন্দ করেন, সিদ্ধান্ত নেন তাঁকেই বিয়ে করবেন। মায়ের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে মনে আর মগজে এমন আঘাতই পেল জেনেভিব, কঠিন একটা ব্যাধি বাধিয়ে বসল। সেই ব্যাধিরই নাম সিজোফ্রেনিয়া। রোগটা হঠাৎ সেরে গেল কিভাবে, এবার নিশ্চয়ই সেটা জানতে চাইবে? শোনো তাহলে। সমস্যার সমাধান পানির মত সহজেই হয়ে গেছে। মায়ের সেই পছন্দ করা ভদ্রলোকটি অকস্মাৎ মারা গেছেন।'

'বলেন কি!'

'হ্যাঁ। এই খবর নিয়ে কাল ওর মা এসেছিলেন। খবরটা শোনামাত্র জেনেভিবের সিজোফ্রেনিয়া গায়েব হয়ে গেল। ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ।'

'ইসাবেল...মানে, জেনেভিব টারোভান তাহলে পাগলাগারদ ছেড়ে চলে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' ডাক্তার ওয়ার্নিক হাসলেন। 'এখানে সুস্থ-স্বাভাবিক লোককে রাখা হয় না। ওর মা তো আজই ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, আমি আটকে রেখেছি। কেন, জানো?'

'কেন?'

'জেনেভিবের বর্তমান অবস্থাটা তোমাকে একবার দেখাতে চাই। মনে হলো তোমার জন্যে এটুকু আমার করা উচিত। উচিত এই জন্যে যে প্রথমে আমিই তোমাকে অনুরোধ করছিলাম...'

'অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন ইসাবেলকে হাসি-খুশি রাখার চেষ্টা করি,'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, মনের তিক্ততা চেপে রাখা গেল না। 'ওকে আমি খুশি করতে পেরেছি কি পারিনি এখন আর তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, এ তো জানা কথা, এখন থেকে ইসাবেল চেষ্টা করবে ওই দিনগুলোর কথা যাতে সে ভুলে যায়।'

'চেষ্টা করবে মানে? সে এরই মধ্যে সব ভুলে গেছে!' ডাক্তার ওয়ার্নিক এখন আর হাসছেন না। 'এই রোগের এটা আরেকটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। রোগটা সেরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গত কয়েক মাসের অতীত তার মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। ইসাবেল তোমাকে চিনতে পারলে সেটা হবে ভারি বিস্ময়কর একটা ব্যাপার।'

'এ-সব কি বলছেন আপনি! এ কি সম্ভব যে ইসাবেল আমাকে ভুলে যাবে!'

'সম্ভব কিনা এখুনি জানতে পারব,' বললেন ডাক্তার। 'খেয়াল করোনি বোধহয়, টেবিলে আজ চারটে চেয়ার?'

'খেয়াল করেছি, কিন্তু কারণটা বুঝতে পারিনি।'

'কারণটা হলো,' বললেন ডাক্তার, 'ইসাবেল আর তার মাকে আজ আমি এখানে দাওয়াত দিয়েছি।'

ডাক্তার থামতেই একজন নার্স ঢুকল ভেতরে। ইসাবেল ও তার মা এসেছেন, এই খবরটা দিয়ে চলে গেল সে।

ডাক্তার ও আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। মায়ের সঙ্গে ভেতরে ঢুকল ইসাবেল। ডাক্তারের কথাই ঠিক, ইসাবেলের মাকে দেখে বয়স বোঝা যায় না। স্বাস্থ্যও খুব ভাল। ইসাবেলের মত বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকতে তিনি নিজে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে চাক্ষুষ দেখার পর এটা অস্বাভাবিক বা অন্যায় বলে মনে হলো না।

ওয়ার্নিক বিজ্ঞান চর্চা করেন। সন্দেহ নেই, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমার মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যেই ইসাবেলের সঙ্গে এখানে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছেন। আলাপ শুরু হবার একটু পরই মিসেস টারোভানকে নিয়ে টেবিল ছাড়লেন তিনি, দূরে একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। খাবার পরিবেশন করতে নার্সরা আরও খানিক সময় নেবে।

এই সুযোগে আমি ডাকলাম, 'ইসাবেল।'

মুখ তুলে এদিক ওদিক তাকাল ইসাবেল। কাছাকাছি দুর্বোধ্য কোন শব্দ হলে, শব্দটা কোন দিক থেকে এল জানার জন্যে আমরা যেভাবে এদিক-ওদিক তাকাই, ইসাবেলও সেভাবে তাকাচ্ছে।

আবার নামটা উচ্চারণ করলাম আমি, 'ইসাবেল।'

এবার সে বুঝতে পারল, শব্দটা আমি করছি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে। 'আপনি কি কিছু বলছেন?'

আমি ধৈর্য হারিয়ে বলে ফেললাম, 'ইসাবেল! তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি...আমি রুডল্‌ফ্।'

'রু-ড-ল্-ফ্? রুডল্‌ফ্ কে?' ইসাবেলকে হতভম্ব দেখাচ্ছে।

বললাম, 'আপনার সঙ্গে বেশ অনেক দিন কথা হয়েছে আমার। আমরা অনেক বিষয় নিয়ে গল্প করেছি। আপনার কি কিছুই মনে নেই?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অনেকদিন? আপনার একটা কথা তো ঠিকই, এখানে আমি অনেকদিন হলো আছি। গল্প? হ্যাঁ, অনেকের সঙ্গেই অনেক গল্প হয়েছে। কিন্তু...আমার তো একটা কথাও মনে পড়ে না! না, কিছুই আমার মনে নেই!'

আমি বোবা হয়ে বসে থাকলাম।

ইসাবেল জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ইসাবেল বলছিলেন কাকে? কাকে ডাকছিলেন?'

আমি একটা ঢোক গিলে বললাম, 'না, কাউকে ডাকছিলাম না। এমনি নামটা শুধু শুধু উচ্চারণ করছিলাম। ওই নামে একজনকে চিনতাম আর কি। চিনতাম মানে, সামান্য পরিচয় ছিল।'

'কে সে? এখানে ছিল বুঝি? তারপর চলে গেছে?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'না, এখানে সে ছিল না। চলেও যায়নি।'

'তাহলে কি হলো তার?' ইসাবেল খুব বিস্মিত হয়েছে।

'সে একদিন মারা গেল।'

'ইস্। শুনে সত্যি খুব দুঃখ পেলাম।'

'না, দুঃখ পাবার তেমন কিছু নেই,' বললাম আমি। 'কারণ সে জানতেও পারেনি যে সে মারা গেছে।'

পরদিন ঘুম ভাঙার পর পৃথিবীটা মনে হলো একেবারে ফাঁকা। এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, পাহাড় চূড়ার উন্মাদ আশ্রম আমার অন্তরে কি বিশাল একটা জায়গা দখল করে রেখেছিল। হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখছি, সবই আমি হারিয়েছি। অন্তরের খালি জায়গা ভরে দেবে, এমন কিছুই কোথাও নেই।

জর্জ ক্রলের চাকরি করি। চাকরি হিসেবে এটার কি-ই বা এমন মূল্য। কোন রকমে খাওয়াটা চলছে। তাও চলত না ওই অভিশপ্ত কুপনগুলোর সহায়তা না পেলে। আজ মনে হচ্ছে, এডওয়ার্ডের প্রতি অন্যায়ই করছি আমরা। বেচারিকে শুধু শুধু কৃপণ আর ছোটলোক বলে গাল দিয়েছি। আজ ভাবতে গিয়ে প্রশ্ন উঠছে, আমি নিজেও কি কম স্বার্থপর? সামান্য দূরদৃষ্টি ছিল, সেটা কাজে লাগাই এক সময়, ফলে মাসের পর মাস বেচারা এডওয়ার্ডকে চলতি বাজার দর থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ পেয়ে যাই—এটাকে মুনাফাবাজি ছাড়া আর কি বলা যায়?

দূর, না, এ-কাজ আর করব না।

এডওয়ার্ডের ভালহাল্লায় আর যাব না। এই ওয়ার্ডেনব্রাক শহরেই আর থাকব না। এখানে থাকব না, কারণ এখানে থাকলে জর্জের চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি ধরতে হবে। জর্জ তো আমাকে এত বেতন দিতে পারবে না যে সেই বেতনের টাকায় ন্যায্য দামে অন্য হোটেলে খাওয়া যাবে।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওয়ার্ডেনব্রাকে থাকব অথচ জর্জের চাকরি করব না, এটা সম্ভব নয়। আবার জর্জের চাকরি করলে খেয়ে-পরে বাঁচার ব্যবস্থা হয় না। কাজেই এই শহর ত্যাগ করাই সবদিক থেকে ভাল আমার জন্যে। অন্য যে-কোন জায়গায় চলে যেতে পারি, সেখানে এখানকার চেয়ে বেশি আয় করার সুবিধে থাকলেই হলো।

www.BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত পাকা। এখন দেখা যাক সেটাকে কাজে পরিণত করতে কতদিন লাগে।

আশ্চর্য! কল্পনাও করিনি যে এত তাড়াতাড়ি অপেক্ষার অবসান ঘটবে। হপ্তাও ঘুরল না, রিসেনডাল আবার ফিরে এলেন। এসেই জানতে চাইলেন, 'কি হে, এদিকে তোমাদের সব খবর কি? বিলটা নিয়ে কোন গোলমাল হয়নি তো? প্যারিসে গিয়ে আটকা পড়ে গেলাম, সেই থেকে দুশ্চিন্তায় আছি...'

জর্জ বলল, 'কেলেঙ্কারি একটা হত, তবে ঈশ্বরই রক্ষা করেছেন। আমরা কি কেউ জানতাম নাকি যে আমাদের লাডউইগ বেচা-বিক্রিতে এক নম্বর ওস্তাদ লোক? অচল একটা মাল চালিয়ে দিল ও। সেই অবিলিস্কটা! পঞ্চাশ বছর ধরে পড়ে ছিল, একচুল নড়ানো যায়নি! ওটাই লাডউইগ আড়াইশো ডলারে বিক্রি করে দিয়েছে...'

আরও অনেক কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল জর্জের, কিন্তু আমার নাম শুনে তাকে বাধা দিলেন রিসেনডাল, বললেন, 'লাডউইগের কথা যখন উঠল, তাহলে তোমাকে বলেই ফেলি। ওকে আর তুমি ধরে রাখতে পারছ না, জর্জ। আমি ওর জন্যে বার্লিনে একটা কাজ যোগাড় করেছি। খবরের কাগজের চাকরি। ছোট একটা পদ থেকেই শুরু করতে হবে ওকে, তবে ধাপে ধাপে ওঠার সুযোগ আছে—এমন কি একদিন সম্পাদকও হতে পারবে।'

জর্জ আমার প্রাণের বন্ধু। তার মত অকৃত্রিম দরদী সুহৃদ্ আমি কি আর জীবনে পাব? বার্লিনে আবার চাকরি হয়েছে শুনে খুশি হলো সে, কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখ পেল আমাকে হারাতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে। আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এ-কথা ভেবেও সে খুশি; কিন্তু উদ্বিগ্ন নিজের ব্যবসার ভবিষ্যৎ নিয়ে। রিসেনডালের বিল মেটাবার পরও জর্জের হাতে পঞ্চাশ ডলার ছিল। ওই পঞ্চাশ ডলারের অর্ধেকই সে আমার হাতে গুঁজে দিল। বলল, এটা আমার কমিশন। কাঁদুনে অস্কারের মত নামকরা সেলসম্যানও এত মোটা কমিশন কখনও পায়নি কারও কাছ থেকে।

সেই পঁচিশ ডলার সম্বল করে ওয়ার্ডেনব্রাক ছাড়লাম। স্টেশনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার পাশে থাকল জর্জ।

'আবার দেখা হবে,' চলন্ত ট্রেন থেকে চিৎকার করে বললাম আমি তাকে।

জর্জ কিন্তু আমার এই কথার জবাব দিল না। তার হয়তো ধারণা, আর দেখা হবে না।

রিসেনডালের ভবিষ্যদ্বাণী অলস সময় নিয়ে ফলতে লাগল। এক এক করে অনেক বছর পার হয়ে যাচ্ছে, আমিও ধাপে ধাপে চাকরিতে উন্নতি করছি। শত ব্যস্ততার মধ্যে প্রায়ই ভাবি, 'এবার একদিন ওয়ার্ডেনব্রাকে যেতে হয়।' কিন্তু সময়ের অভাবে যাওয়া আর হয় না।

তারপর যাবার রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হলো হিটলারি কেয়ামত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আমার অবশ্য ভাগ্যটা নেহাতই ভাল। কারণ ঠিক ওই সময় বিশেষ একটা কাজে আমেরিকায় যেতে হলো। গিয়েছিলাম খবরের কাগজের প্রতিনিধি হয়ে, কিন্তু ওখানে আমাকে বন্দী করা হলো রাজনৈতিক কারণে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দীর্ঘ সাত বছর পর দেশে ফেরার সুযোগ হলো। ইতিমধ্যে যুদ্ধ থেমে গেছে। ফিরলাম বটে নিজের দেশে, কিন্তু দেখলাম দেশটাকে আর প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। জার্মানি ভেঙে পড়েছে, ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাকে দেখে দেশ যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দেশে ফেরার পর দুটো কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। প্রথম কাজ, খবরের কাগজটার আগের সুনাম ফিরিয়ে আনা। দ্বিতীয় কাজ, পরিচিত লোকজনকে খুঁজে বের করা।

পরিচিতদের মধ্যে দু'জনের কথাই বেশি করে মনে পড়ল। জর্জ ক্রল আর জেনেভিব টারোভান।

সতেরো বছর পার হয়ে গেছে, আবার আমি হাজির হলাম ওয়ার্ডেনব্রাকে। হাজির হলাম ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্যেই।

ওয়ার্ডেনব্রাকে পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার পরিচিত সেই ওয়ার্ডেনব্রাক আর নেই। যুদ্ধের সময় রেল-জংশন হিসেবে এই শহর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই এখানে অসংখ্য বোমা ফেলা হয়েছে, কোন বিরতি ছাড়াই। ফলে বাড়ি-ঘর উড়ে গেছে, রাস্তা-ঘাট ধ্বংস হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাই, চিনতে পারি না। দু'পা যেতেই পথ হারিয়ে ফেলি।

পাহাড় চূড়ার ওপর উন্মাদ আশ্রমে গেলাম। যুদ্ধের অভিশাপ থেকে এটাই শুধু রক্ষা পেয়েছে। খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম, ডাক্তার ওয়ার্নিক নেই। কোথায় গেছেন, বেঁচে আছেন কিনা, কেউ তা বলতে পারল না। যুদ্ধ তখন মাত্র শুরু হয়েছে, পাগলাগারদের সংরক্ষিত ওয়ার্ডে কয়েকজন ইহুদিকে গোপনে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যাপারটা গোপন থাকেনি। হিটলারি নির্যাতনের ভয়ে আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে যান ডাক্তার। সেই থেকে তাঁর কোন খবর নেই। সবার ধারণা, হিটলার বাহিনীর হাতে ধরাই পড়েছিলেন তিনি, অর্থাৎ খুন হয়েছেন।

ইসাবেল? নাহ্, ওরও কোন খবর পাওয়া গেল না। ইসাবেলকে আগেই হারিয়েছিলাম। এবার জেনেভিব টারোভানকেও হারালাম।

কিন্তু জর্জ? আমার প্রাণের দোস্ত জর্জ ক্রল? তার পরিণতি খুব করুণ। শুনে বুকটা দুঃখে ফেটে গেল আমার। সেই কসাইয়ের কথা মনে আছে তো? ঘোড়া জবাই করত? নাম ছিল ওয়াজটেক? লোকটা হিটলারের অকারণ ভক্ত ছিল, আর জর্জের ছিল অকারণ শত্রু। যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়ে ওঠে সে। এই সুযোগে জর্জের ওপর প্রতিশোধ নিতে তার কোন অসুবিধে হয়নি। তার কথায় জর্জকে গ্রেফতার করা হয়, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। আমার দুর্ভাগা বন্ধু জর্জ কোন বিচার পায়নি। তাকে বন্দী শিবিরে আটকে রাখা হয়। বলতে গেলে আরাম-আয়েশেই মানুষ সে, বন্দী-শিবিরের অত্যাচার শরীরে সয়নি। ওখানেই মাস কয়েকের মধ্যে মারা যায় জর্জ।

কাউকে পেলাম না, তবু ওয়ার্ডেনব্রাক ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। বেশ কয়েকটা দিন ধ্বংসস্তূপে ঘুরে বেড়ালাম। অনেক জিনিসই দেখছি, কিন্তু প্রায় কোনটাই চিনতে পারছি না। একদিন হঠাৎ একটা জিনিস দেখে চিনতে পারলাম।

চারদিকে বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর, আবর্জনার স্তূপ, প্রথমে বুঝতেই পারিনি আমি

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে রয়েছি পৌরসভার কবরস্থানে। চারদিকে ভাঙাচোরা স্মৃতিস্তম্ভ পড়ে আছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র একটা স্তম্ভ। সেটা হলো আমাদের সেই কালো অবিলিস্কটা। চিনতে আমি ভুল করছি? না, ভুল করার প্রশ্নই ওঠে না–স্তম্ভের নিচের দিকে কার্ট ব্যাশ-এর হাতে কাজ রয়েছে না! নামটা সে খোদাই করেছে দক্ষতার সঙ্গে–মিলড্রেড স্যাঙ্কে।

না, আমি ভুলিনি–আয়রন হর্সের ওটাই ছিল আসল নাম–মিলড্রেড স্যাঙ্কে।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG